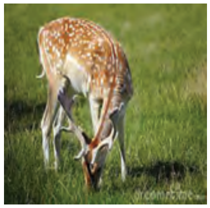

ওপরের ছবিতে যে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের কথা বলা হয়েছে সেগুলি নীচে লিখে সম্পূর্ণ করো:

1. ফুলের মধু → ☐ → ☐
2. গাছের পাতা → ☐ → ☐
3. মশার লার্ভা → মাছ → ☐
4. গাছের ডাল → ☐
5. শস্যের দানা → ☐ → ☐
6. মাছ → ☐ → ☐

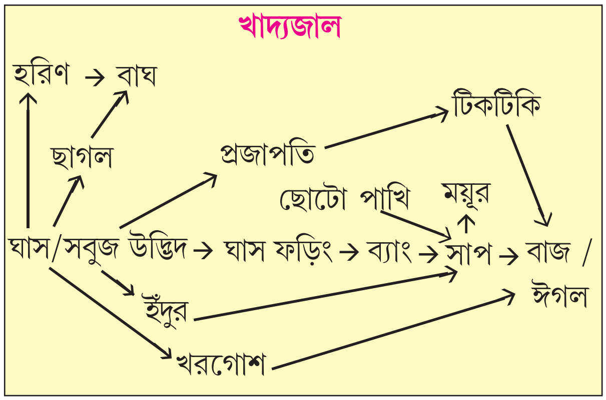

এবার নীচের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলির সাপেক্ষে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করো।

ঘাস, ছাগল, পুঁটি মাছ, বোয়াল মাছ, মাছরাঙা, বক, চিল, ইঁদুর, বাজপাখি, ধানগাছ, মাজরা পোকা, মুরগি, চিতাবাঘ, জেব্রা, সিংহ, গন্ডার, বাঘ।

খাদ্যশৃঙ্খলের ক্রমিক সংখ্যা	খাদ্যশৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত জীব	খাদ্যশৃঙ্খলের চেহারা
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

গাছ ও জলচক্র

সিধু বইতে আমাজন, মালয়েশিয়া, কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালি আর আফ্রিকার বর্ষা অরণ্যের কথা পড়ছিল। গাছ থেকে এত জল বাষ্পীভূত হয় যে এসব অরণ্যে সারা বছরই নাকি বৃষ্টি হয়। অরণ্যের গাছপালার ঘন আবরণ জলীয় বাষ্পকে উবে যেতে দেয় না। সেই বাষ্প ঘন হয়ে জমে ফোঁটা ফোঁটা জল হয়ে মাটিতে পড়ে। তারপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিশে জলের সোঁতা তৈরি করে। সোঁতাগুলো মিলতে মিলতে একসময় নদীর জন্ম হয়।

বর্ষার জলও নানা ঢাল বেয়ে নেমে একসঙ্গে মিলে নদীর জন্ম দেয়। হিমালয়ের বরফগলা জলে জন্ম নেওয়া নদীরা বাদে ভারতবর্ষের আর সব নদীর-ই জন্ম কিন্তু এভাবে। পর্বতের ঢাল যদি অরণ্যের ছায়ায় ঢাকা না থাকে তাহলে সেই জলও তাড়াতাড়ি উবে যায় বাষ্প হয়ে। জলকে বাষ্প হতে না দিয়ে মাটির ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির তলায় ওই জলকে জমতে সাহায্য করে অরণ্য। কুয়ো খুঁড়ে বা টিউবওয়েল বসিয়ে আমরা সেই জল পাই। জঙ্গলে যদি লম্বা আর বড়ো পাতাযুক্ত গাছ বেশি থাকে, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে, জল বিশুদ্ধ থাকে এবং জলের প্রবাহও নিয়ন্ত্রিত হয়।

গাছ ও পরিবেশের তাপমাত্রা

স্কুলে যাওয়ার পথে মৌমিতারা গরমের দিনে কিছুক্ষণ বট গাছটার নীচে দাঁড়ায়। ডালপালা ও পাতার ছাউনি দিয়ে ছাতার মতো কাজ করে ওই গাছটা। গাছের নীচে মাটিতে পা রাখলে ওরা বুঝতে পারে মাটি কত ঠান্ডা। আমবাগানের আম পাহারা দিতে দিতে রহিমদের মাঝে মাঝে আরামে ঘুম চলে আসে। একটা বড়ো আমগাছ জল বাষ্প করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। জল বাষ্প করতে উদ্ভিদদেহ থেকে তাপ শোষিত হয়। এরফলে আশেপাশের পরিবেশও ঠান্ডা হয়ে যায়।

তোমার বাড়ির আশেপাশের আর এরকম কোন কোন গাছ পরিবেশের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে?

1. 2. 3. 4.

গাছ ও ঝড়ের গতিবেগ

কয়েকবছর আগে ‘আয়লা’ নামক এক সামুদ্রিক ঝড় ধেয়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের দিকে। এরকম ঝড়ের মধ্যেই রফিক, নিরঞ্জনদের বাবা-কাকারা মাঝেমধ্যেই যায় সুন্দরবনে মাছ ধরতে। ওর মুখে একথা শুনে স্যার হেসে বললেন - এত প্রবল ঝড়েও দ্বীপগুলোর তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। বাদাবনের গরান, হেঁতালের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বাতাসের বেগ কমে যায়। এভাবেই তো শত শত বছর ধরে বাদাবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ঝড়ের বেগ ষাট থেকে আশি শতাংশ কমিয়ে দেয়। যেসব দেশে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বন এত গভীর বা ঘন হয় না, সেখানে নাকি প্রায়ই এরকম ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়। প্রচুর লোক মারা যায়। বাড়িঘরের ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

এবার বলো তো—

1. বাতাসের গতি কমাতে গেলে গাছের সারি কেমনভাবে লাগানো উচিত ? (বাতাসের গতির সাপেক্ষে সমান্তরাল / আড়াআড়ি ভাবে)।
2. তুমি এরকম বাতাসভাঙা আর কোন কোন গাছের কথা জানো? বট, ঝাউ, ...।

গাছ ও পরিবেশ দূষণ

গরমকালে আমগাছগুলোকে দেখলে ইতুর মায়া হয়। কেমন ধুলোয় ভরা। স্যার ইতুর কথা শুনে বললেন — এত রাসায়নিক পদার্থ, আর গ্যাস বাতাসকে ক্রমাগত দূষিত করছে। আর এই দূষণ থেকেই তো মানুষের এত রোগ। ইতু শুনে বলল — তাহলে আমাদের সামনে খুব বিপদ।

স্যার শুনে বললেন— কদম, বেল, শিরীষের মতো গাছের পাতা এইসব কণাকে ছাঁকনির মতো আটকে রাখে।

ইতুর এবার জানার ইচ্ছে হলো — কোন ধরনের গাছরা ধূলিকণা আটকাতে পারে?

— যেসব গাছের পাতা চওড়া ও লম্বাটে ধরনের তারা বেশি দূষক পদার্থ ধারণ করতে পারে। এরকম তিনটি গাছ হলো— 1. বট 2. আম 3. অশ্বত্থ।

এছাড়াও রাস্তার ধারে চলার সময়ে তুমি লক্ষ করবে কোন কোন গাছের পাতা ওই ধরনের। আবার যে সব গাছে যৌগিক পাতা দেখা যায় তারাও ধোঁয়ার বিভিন্ন গ্যাস শুষে নেয়, ধুলোগুলো পাতার ওপর জমতে থাকে । এরকম গাছগুলি হলো— 1. কৃষ্ণচূড়া 2. গুলমোহর 3. 4. 5.

গাছ ও মাটির ক্ষয়

কিছুদিন ধরেই অম্লান লক্ষ করছে নদীর জল ক্রমশ বাড়ছে। ও জানে এই অল্প বৃষ্টিতেই যদি জল এমন বাড়ে তবে সামনে ভরাবৃষ্টির মরশুমে আবার বন্যা হবে। দুর্গতির সীমা থাকবে না। কেন এমন হয়?

— মাটির ওপর যদি ঘাসের মোটা চাদর না থাকে ।

স্যারের উত্তর শুনে অম্লান কিছুক্ষণ ভাবল। গোরুগুলো যখন ওরকম ঘাসশূন্য মাটিতে চরে, তখন ওদের খুরের ঘষায় মাটির চাঙড় উঠে যায়।

— এর ফলে দুটো ক্ষতি হয় :

(i) জলেভেজা মাটির স্তর ওপরে উঠে আসে। এই জল সূর্যের আলোর প্রভাবে বাষ্প হয়ে গেলে মাটির কণা আরও আলগা হয়ে যায়।

(ii) বৃষ্টির জল মাটিতে পড়লেই আলগা মাটি ধুয়ে নদীতে চলে যায়।

নদীর গর্ভে যদি এভাবে ক্রমশ পলি জমতে থাকে তবে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমতে থাকে। সামান্য বৃষ্টিতেই দু-কূল উপচে জল চলে আসে বসতি এলাকায়। এজন্য আগে যেসব অঞ্চলে বন্যা হতো না, আজকাল সেখানেও বন্যা হচ্ছে। আর ওপরের মাটির সঙ্গে পুষ্টিও ধুয়ে চলে যাওয়ায় মাটিও উর্বরতা হারাচ্ছে।কোন ধরনের গাছ মাটিতে পুঁতলে এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে বলে তোমাদের মনে হয়? ....।

গাছ ও জীবের আশ্রয়স্থল

তোমার বাড়ির পাশে যদি কোনো আম/বট/অশ্বত্থ/শিমুল/তেঁতুল বা অন্য কোনো বড়ো গাছ থাকে তবে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখো তো গাছে কোন কোন প্রাণী বাস করে।

1. পোকামাকড় —
2. পাখি —
3. স্তন্যপায়ী —
4. সরীসৃপ —

একটা গাছ যদি এত প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, তবে বুঝতেই পারছ একটা বনে কত রকমের প্রাণী থাকতে পারে। এবার বলো তো নীচের অরণ্যগুলিতে কোন কোন প্রাণী থাকে বা থাকতে পারে।

1. সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যে (সূঁচের মতো পাতাযুক্ত গাছের বন) — তুষারচিতা, লালপান্ডা, ..., ... ।
2. পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে — বাঘ, হাতি, ..., ... ।
3. ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদের অরণ্যে — বাঘ, খাঁড়ির কুমির, ..., ... ।
4. ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের অরণ্যে — একশৃঙ্গ গন্ডার, হরিণ, ..., ... ।
5. জলাভূমি সংলগ্ন অরণ্যে — বেজি, ভোঁদড়, ..., ... ।
6. বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড়ে — গোসাপ, শেয়াল, ..., ... ।

গাছ ধ্বংস হওয়ার জন্যই আজ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কত প্রাণী। এরকম কয়েকটি বিপন্ন প্রাণীর নাম করো যারা বেঁচে থাকে গাছের ওপর নির্ভরশীল হয়ে।

প্রাণীর নাম	খাদ্য/আশ্রয়দাতা গাছের নাম
1. হাড়গিলে	
2. প্যাঁচা	
3. ভাম	
4. হনুমান	

গাছ ও শব্দদূষণ

আজ কদিন ধরে যাত্রার প্রচার উপলক্ষ্যে মাইকটা দিনরাত বেজে চলেছে। কবীরের কান ঝালাপালা। বুকটাও কেমন ধড়ফড় করছে। ও বুঝতে পারছে না রাতে শোয়ার অনেকক্ষণ পরেও ঘুমটা কেন আসছে না। শব্দ এভাবেই নাকি আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। গাছ শব্দের এই তীব্রতাকে কোনোভাবে কমাতে পারে কী?

— শব্দকে জব্দ করতে পারে বেল, ছাতিম ও জারুলের মতো গাছ। বনের গভীরতা যত বাড়ে শব্দের প্রাবল্য তত কমে। শব্দের প্রাবল্য কমানোর জন্য তুমি 'অরণ্য সপ্তাহে' কোথায় কোথায় গাছ পুঁতবে -

1. যানবাহন চলাচলের পথের দু-পাশে
2.
3.
4.
5.

পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষ্যে পীযূষরা গাছের এত উপকারের কথা জানতে পেরে অবাক হয়ে গেল। পরিবেশবিদ প্রধান অতিথি বললেন — সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য পরিবেশের সবরকম জৈব ও অজৈব উপাদানের ভাণ্ডার। উপকূলবর্তী অঞ্চলকে বছরের পর বছর ধরে উর্বর রেখেছে। একটা পরিণত ম্যানগ্রোভ

গাছ বছরে প্রতি এক হেক্টর জমিতে 47 কেজি নাইট্রোজেন, 26 কেজি পটাশিয়াম, 99 কেজি ক্যালশিয়াম, 34 কেজি ম্যাগনেশিয়াম আর 32 কেজি সোডিয়াম সরবরাহ করে। এজন্য এদের বাঁচিয়ে রাখা খুব জরুরি। গাছ তথা অরণ্য ধ্বংস করলে মানুষ শুধু কাঠ পায়। কিন্তু তার ফলে পরিবেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

এবার তাহলে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে তোমরা পরিবেশকে বাঁচায় এমন কোন কোন গাছ পুঁতলে তা লিখে ফেলো:

(i) বিদ্যালয়ে ....

(ii) রাস্তার দু-ধারে ....

(iii) চাষের জমির আশেপাশে ....

(iv) পুকুর পাড়ে ....

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য

পরিবেশের সংকট ও দৈহিক স্বাস্থ্য

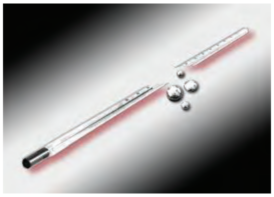

জ্বর মাপার জন্য আমরা কোন যন্ত্র ব্যবহার করি? ....।

ইলেকট্রিক বালব বা টিউবলাইটের বদলে রাস্তায় ইদানীং কোন ধরনের আলো ব্যবহার করা হচ্ছে? ....।

CFL

থার্মোমিটারে তরল রূপে বা ফ্লুওরেসেন্ট বালব তৈরি করতে বাষ্প রূপে একটি বিশেষ ধাতু ব্যবহার করা হয়। ধাতুটি তরল প্রকৃতির। ধাতুটি কী? ....।

ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষ নানা প্রয়োজনে তামা, লোহা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, পারদ ও নিকেলের মতো বহু ধাতু ব্যবহার করেছে। এই সকল ধাতুর নানা অজৈব ও জৈব যৌগ মানুষের দেহে খাদ্য বা পানীয়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ থেকে প্রবেশ করেছে। আর তা থেকেই নানা রোগ দেখা দিচ্ছে।

টুকরো কথা

জাপানের সমুদ্রের ধারে এক ছোটো শহর হলো মিনামাতা। 1908 সালে সেখানে চিসো কর্পোরেশন একটা কারখানা খোলে। ওই কারখানা থেকে পারদ মেশানো বর্জ্য ক্রমাগত সমুদ্রের জলে মিশতে থাকে। 1930-এর দশক থেকে দেখা গেল ওখানে বেড়াল ও মানুষ এক অজানা কারণে মারা যেতে লাগল। 1956 সালে বহু মানুষের দেহে একইরকম উপসর্গ দেখা যেতে লাগল — পেশির খিঁচুনি, দেহ ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া, জিভ ও মুখের পেশি অসাড় হয়ে যাওয়া। অনেক বিকলাঙ্গ ও অন্ধ শিশুরও জন্ম হলো। খোঁজখবর করে জানা গেল যে ওই এলাকার আক্রান্ত মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রের মাছ ও কাঁকড়া খেয়েছেন। আর তার মধ্য দিয়েই বিষাক্ত পারদের যৌগ ওই মানুষদের দেহে প্রবেশ করেছে। আর তা থেকেই এই সংকটের সূচনা।

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো মানুষের দেহে আর কোন কোন উৎস থেকে পারদ প্রবেশের ঝুঁকি থাকতে পারে।

(1) ...., (2) ...., (3) ...., (4) ....।

সুবীর নস্করের বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগণা আর মনোজ হেমব্রমের বাড়ি বীরভূম জেলায়। দীর্ঘদিন ধরে অন্যদের মতো ওরাও চামড়া ও দাঁত, হাড়ের সমস্যায় ভুগছে।

সুবীর নস্করের অসুখ	মনোজ হেমব্রমের অসুখ
(1) হাতের ওপরের তালুতে খসখসে উঁচু উঁচু ছোপ।	(1) দাঁতে ছোপ ছোপ দাগ।
(2) চামড়ার রং কালো।	(2) দাঁত ও হাড় প্রায়ই ভেঙে যায়।
(3) বুকে ও পিঠেতে কালো ছোপ।	(3) পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।
(4) পায়ের নানা জায়গায় ক্ষত।	(4) চলার সময় হাঁটু দুটি ঠোক্কর খায়।

সুবীর ও মনোজকে দেখে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইডের প্রভাবেই নাকি এই ধরনের অসুখ হয়।

টুকরো কথা

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার মাটির নীচে আর্সেনিকের বেশ কিছু খনিজের একটা স্তর আছে। কৃষিজমিতে সেচ ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভের জল নলকূপ দিয়ে তুলতে শুরু করে। নলকূপের মধ্য দিয়ে বায়ুর অক্সিজেন ঢুকতে শুরু করে। ওই অক্সিজেনের সঙ্গে আর্সেনিকের অদ্রাব্য খনিজ বিক্রিয়া করে নানা দ্রাব্য যৌগে পরিণত হতে শুরু করে। ওই যৌগ মেশানো জল দীর্ঘদিন ধরে পান করলে দেহে সুবীরের অসুখের মতো অসুখ দেখা যায়। এক লিটার জলে 0.05 মিলিগ্রাম বা তার বেশি মাত্রায় আর্সেনিক থাকলে সেই জল খাওয়া উচিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মালদহ জেলায় মাটির নীচে ফ্লুওরিনের কিছু খনিজ পদার্থ আছে। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভূগর্ভস্থ জলে কিছুটা ফ্লুওরাইড আয়ন দ্রবীভূত হয়। নলকূপের সাহায্যে ওই জল তুলে দীর্ঘদিন পান করলে মনোজের অসুখের মতো অসুখ দেখা যায়। এক লিটার পানীয় জলে 1.5 মিলিগ্রামের বেশি ফ্লুওরাইড থাকলে দাঁত ও হাড়ের নানা সমস্যা দেখা দেয়।

এবার তোমরা জানার চেষ্টা করো মানুষের দেহে আর কোন কোন উৎস থেকে আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড প্রবেশের ঝুঁকি থাকতে পারে।

(1) ...., (2) ...., (3) ...., (4) ....।

মানুষের বিভিন্ন পেশা-সমস্যা ও রোগ

পাশের ছবিগুলোর মতো এমন পেশায় অসংখ্য মানুষ আজ যুক্ত। দেখা যায়, দীর্ঘদিন ওই পেশায় যুক্ত থাকার পর ওইসব মানুষরা কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাহলে কী ওপরের ছবির মানুষরাও নানা রোগে আক্রান্ত? নীচের তালিকায় ওই সকল পেশায় যুক্ত মানুষদের সমস্যাগুলো লক্ষ করো। সংশ্লিষ্ট পেশা ও রোগের মধ্যে সমতা বিধান করো।(একই অসুবিধা/রোগ একাধিক পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে)

উপরের ছবিতে উল্লিখিত বিভিন্ন পেশা	সংশ্লিষ্ট রোগ
1. মোটর গাড়ি চালানো	(ক) পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথা, চোখের সমস্যা
2. কারখানায় কাজ করা	(খ) পায়ের পাতার হাড়ে সূক্ষ্ম চিড়
3. মাটি কাটা	(গ) পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথা
4. ফুটবল খেলা	(ঘ) হাড় ভেঙে যাওয়া, কার্টিলেজ ছিঁড়ে যাওয়া
5. উনুনের সামনে রান্না করা	(ঙ) হাঁটু মুচড়ে কার্টিলেজ ছিঁড়ে যাওয়া
6. খনিতে কাজ করা	(চ) ফুসফুসে কয়লার গুঁড়ো জমে যাওয়া
7. মাঠে ধান রোওয়া ও চাষ করা	(ছ) পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথা
8. ল্যাবরেটরিতে কাজ করা	(ঝ) হাতে ও ঘাড়ে ব্যথা
9. মাথায় করে ভারী জিনিস বহন করা	(ঞ) ঘাড়ে ব্যথা ও চোখের সমস্যা
10. মাংস কাটা	(ট) হাতের সমস্যা
11. হাতুড়ি ও ছেনি দিয়ে কাজ করা	(ঠ) ক্যানসার
12. চাষের জমিতে ফসল কাটা	

পেশাগত রোগের বিভিন্ন কারণ

মানুষ বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘ সময় থেকে কাজ করে। এ সকল ভৌত ও রাসায়নিক প্রভাবক মানুষের শরীরে নানারকম প্রভাব ফেলে। এবার এসো দেখি কোন কোন প্রভাবকের জন্য মানুষের শরীরে নানা পেশাগত ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

(A) **ভৌত পরিবেশ :**

1) **আলো :** আলোর উৎসের ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করো—

(a) কেমন বাড়িতে থাকেন? খুব খোলামেলা/ অল্প খোলামেলা/কম খোলামেলা।

(b) কীরকম জায়গায় কাজ করেন? কারখানা/স্টুডিয়ো/ মাঠ/রাস্তা/বাজার/ বাস/ ট্রেন/খনি।

(c) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় আলোর উৎস কৃত্রিম না প্রাকৃতিক? ....।

(d) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় আলোর উজ্জ্বলতা কেমন ? ....।

(e) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় থেকে আলোর উৎসের দূরত্ব কত (পায়ে মেপে দেখো)? ....।

(f) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় আলো এক জায়গায় লাগানো নাকি হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করা যায়? ....।

(g) বাড়িতে ও কাজের জায়গায় ব্যবহৃত আলোর রঙের বৈশিষ্ট্য কী? ....।

এবার ওপরের আলোচনার সাপেক্ষে নীচের পেশায় কী কী সমস্যা হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

- অন্ধকার খনিতে বা ডার্করুমে যারা একটানা অনেকক্ষণ ধরে কাজ করেন ....।
- চোখ ঝলসানো আলোর নীচে দীর্ঘ সময় বসে কাজ করতে থাকলে ....।
- মৃদু আলোতে দীর্ঘ সময় ধরে লেখালেখির কাজ করলে ....।

শব্দভাণ্ডার : চোখের দৃষ্টিতে সমস্যা, পিঠে ও ঘাড়ে সমস্যা, মাথা ব্যথা ও মাথা ঘোরা।

(2) **এক্স রশ্মি :** রোগীর শরীরের ভেতর আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলতে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এই রশ্মি বেশি এবং বারবার সরাসরি কোশের সংস্পর্শে এলে কোশের ক্রিয়া অস্বাভাবিক করে দিতে পারে। এমনকি কোশ ধ্বংস করে দিতে পারে। ফলে মানবদেহের নানা অঙ্গে কী কী প্রভাব পড়তে পারে তা নীচে লেখো (শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে লেখো)।

(a) খাদ্যনালী ....।

(b) ফুসফুস ....।

(c) অস্থিমজ্জা ....।

ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি পদার্থ ও তাদের যৌগ থেকে অবিরাম ভাবে কিছু অদৃশ্য রশ্মি বের হয়। এইসব রশ্মি ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। এদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

শব্দভাণ্ডার : রক্তকোশ ঠিকমতো তৈরি না হওয়া, বমির ভাব, খিদের ভাব না হওয়া, পাতলা পায়খানা, শ্বাসকষ্ট, রক্তক্ষরণ, ক্যানসার।

এছাড়াও একাধিক ভৌত কারণে বিভিন্নরকম বিপদের সম্ভাবনা থাকে এবং মানবদেহে নানা ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। নীচের তালিকাটি তোমরা বন্ধু বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে পূরণ করো।

পেশাগত ক্ষেত্রের ব্যাধি সৃষ্টিকারী অন্যান্য ভৌত কারণসমূহ	সৃষ্ট রোগ/উপসর্গসমূহ
1. বিদ্যুৎ	শক লাগা, ..., ...,
2. তাপ	পুড়ে যাওয়া ...., ..., ...,
3. শৈত্য	তুষার ক্ষত, ..., ...,
4. শব্দ	বধিরতা, ..., ...
5. তেজস্ক্রিয় পদার্থ	রক্তাল্পতা, ..., ...

(B) **রাসায়নিক পরিবেশ :** মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসেছে। নানারকম রোগও এর ফলে মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছে। এবার তোমরা নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো—

1. প্রাচীন মিশরীয়রা পোড়ামাটির বাসনপত্র অলংকৃত করতে কোন ধাতুর যৌগ ব্যবহার করত? ....। (লোহা/তামা/জিঙ্ক)

2. খনির বন্ধ বাতাসের মধ্যে কোন গ্যাস থাকলে শ্রমিকদের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে?
.... (হাইড্রোজেন/অক্সিজেন/কার্বন মনোক্সাইড)।

3. প্রসাধনী সামগ্রী, সুতিবস্ত্র ইত্যাদি রং করতে কোন রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয়?
.... (জল/সোডিয়াম ক্লোরাইড/ সংশ্লেষিত জৈব রঞ্জক)।

4. দেয়ালের রং, খেলনা, গাড়ির ব্যাটারি তৈরি করতে কোন ধাতু বা ধাতুর যৌগ ব্যবহার করা হয়?
............(লোহা/সোডিয়াম/সিসা)

ওপরের আলোচনায় আমরা রাসায়নিক পরিবেশের নানা ধরনের উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হলাম। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী এরা হলো —

রাসায়নিক প্রকৃতি	উপাদানের নাম
1. গ্যাস	............., ..., ..., ... ।
2. ধাতু	........, ... ।
3. সংশ্লেষিত যৌগ	............, ... ।

আদিম মানুষকে শিকার, পশুপালন কিংবা অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হতো। ফলে রক্তের ফ্যাট বা গ্লুকোজকে অনবরত পোড়াতে হতো। কিন্তু যন্ত্র যখন থেকে মানুষের নানা কাজে বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হতে থাকল পরিশ্রম ততই কমতে থাকল। বহু মানুষ এমন পেশায় যুক্ত হতে থাকলেন যেখানে কায়িক শ্রমের তুলনায় মানসিক শ্রম বেশি। চেয়ার-টেবিলে বসে লেখা, হিসেব-নিকেশ করা, কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করার মতো পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশির সঞ্চালন কম হয়। বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ কমে যায়। এই পেশাগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের রক্তের গ্লুকোজ বা ফ্যাটকে সেভাবে পোড়ানোর দরকার হয় না। অতিরিক্ত গ্লুকোজ ও ফ্যাট রক্তে ক্রমাগত জমা হতে থাকে। এবার বন্ধুদের, শিক্ষক/শিক্ষিকা বা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো এধরনের পেশায় কোন কোন রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(1) ডায়াবেটিস (2) উচ্চ রক্তচাপ (3) ঘাড়ে ব্যথা, (4) অনিদ্রা, (5) ...., (6) .... ।

তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে-কোনো পেশাতেই কোনো না কোনো রোগের প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এবার নীচের পেশাগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কী কী রোগ হয় বা সমস্যা প্রকাশ পায় তা লেখার চেষ্টা করো।

পেশার নাম	সংশ্লিষ্ট রোগ/সমস্যা
1. যাঁরা চা পাতা তোলার কাজ করেন	
2. যাঁরা ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন	
3. যাঁরা কাঠের কাজ করেন	
4. যাঁরা মাল বহন করেন	
5. যাঁরা রিকশা টানেন	
6. যাঁরা উনোনের সামনে দীর্ঘ সময় রান্না করেন	
7. যাঁরা তুলো নিয়ে কাজ করেন	
8. যাঁরা হাসপাতালে কাজ করেন	
9. যাঁরা বিভিন্ন খনিতে কাজ করেন	
10. যাঁরা নির্মাণ শিল্পে কাজ করেন	
11. যাঁরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন	
12. যাঁরা নানা ধরনের কারখানায় কাজ করেন	
13. যাঁরা পাটকলে কাজ করেন	
14. যাঁরা বিভিন্ন জিনিস ফেরি করেন	

শব্দভাণ্ডার : বাত, পেশিতে খিঁচধরা, ঘাড়ে ব্যথা, বমিবমিভাব, কম বা বেশি খিদে পাওয়া, চোখজ্বালা, শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, ত্বকে ক্ষত, হাড় ভেঙে যাওয়া, অস্থিরতা, বধিরতা, আগুনে পুড়ে যাওয়া, ক্যানসার, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, রক্তাল্পতা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, হিট ক্র্যাম্প, আঙুলের ডগায় পচন, পায়ের শিরায় অসুখ।

স্বাস্থ্যের প্রকৃতি(দৈহিক, মানসিক)

স্বাস্থ্য বলতে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতাকে বোঝায় কেবল নীরোগ অবস্থাকে নয়। অনেক সময় আমাদের শরীরের মধ্যে রোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যা বাইরে ধরা পড়ে না। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে নীরোগ দেখালেও ভিতর থেকে আমরা অসুস্থ।

তুমি তোমার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কি কি করো ?

সকালে	দুপুরে	বিকালে	রাত্রে
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
3.	3.	3.	3.
4.	4.	4.	4.

তোমার শেষ কবে শরীর খারাপ হয়েছিল? তখন কি হয়েছিল?

তখন কি কি অসুবিধা হয়েছিল ?

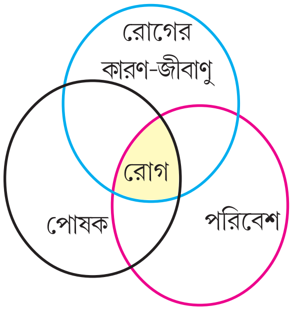

রোগ সৃষ্টির কারণ (যেমন জীবাণু, দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ ইত্যাদি) আর পোষক এই দুয়ের আন্তঃক্রিয়াই রোগ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন রোগের অনুকূল পরিবেশ (যেমন আর্দ্রতা , তাপমাত্রার পার্থক্য ইত্যাদির কারণে রোগ হয়)। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা করতে প্রয়োজন রোগপ্রতিরোধ। যা কয়েকটি ধাপে হতে পারে—

(1) **টিকাকরণ কর্মসূচি, খাদ্যে বাইরে থেকে পুষ্টি উপাদান(আয়োডিন, আয়রন, ভিটামিন) যোগ করা।**

(2) **রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।**

(3) **ভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন (Differently abled) মানুষের পুনর্বাসন।**

(4) **জীবনকুশলতা শিক্ষা।**

> জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তার মোকাবিলা করতে হয়। এছাড়াও নানাসময়ে আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে হয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এসবের মধ্য দিয়েই সংবেদনশীল ও সমাজমনস্ক মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার শিক্ষা হলো জীবনকুশলতা শিক্ষা।

Unicef, WHO পরিকল্পিত দশটি জীবনকুশলতা আমরা আলোচনা করব।

ভাবার কুশলতা	সামাজিক কুশলতা	বাধাবিপত্তি এড়ানোর কুশলতা
1. আত্মসচেতনতা 2. বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা 3. সিদ্ধান্ত নেওয়া 4. সমস্যা দূর করা 5. সৃজনশীল চিন্তা	6. পারস্পরিক সংযোগস্থাপন 7. পারস্পরিক সম্পর্ক 8. সমানুভূতি	9. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ 10. আবেগ নিয়ন্ত্রণ

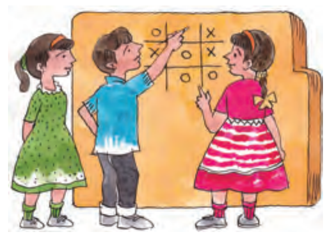

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে চারটি করে কার্ড দেওয়া হলো। এবার চটপট লিখে ফেলো তো।

1. ওপরের ছবিগুলোতে কি কি দক্ষতা দেখানো হয়েছে?
2. তোমার কি কি দক্ষতা আছে বলে মনে করো? (আলাদা কার্ডে লেখো)
3. তোমার কোন কোন কুশলতার বিকাশের প্রয়োজন আছে বলে মনে করো?

লেখা শেষে কার্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করো।

World Health Organization (WHO)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের অধীন। বিশ্বের মানবসম্পদের স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করে। 1949 সালে 9ই এপ্রিল স্থাপিত হয়। হেডকোয়ার্টার হলো সুইজারল্যান্ডের জেনিভায়।

UNICEF- United Nations International Children's Emergency Fund

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে মানবিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। 1946 সালের 11ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে এই সংস্থা গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জরুরিকালীন খাদ্য এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যই এই সংস্থা গঠিত হয়।

পাশের ছবিটিতে দেখানো গল্পটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো। তারপর নীচের কাজটি করে ফেলো।

গল্পে কাক কীভাবে তার সমস্যার মোকাবিলা করেছিল ?

সমস্যা কী কী ছিল	কাক কীভাবে সমাধান করেছিল
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

এবার তোমরা তোমাদের জীবনে সমস্যা সমাধানে কী কী কুশলতা প্রয়োগ করতে পারো তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো।

সমস্যা	জীবনকুশলতা
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

নিজেকে জানো

নীচের ছবিগুলিতে কি কি ধরনের অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে তা নীচের বক্সে লিখে ফেলো।

কর্মপত্র

1. আমার নাম : ....।

2. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক : ....।

3. আমার সবথেকে ভালে লাগে : ....।

4. আমার প্রিয় রং : ....।

5. আমার খুব আনন্দ হয় যখন: ....।

6. আমার খুব দুঃখ হয় যখন : ....।

7. আমার খুব রাগ হয় যখন : ....।

8. আমার শরীরে যা যা অসুবিধা হয় : ....।

9. অসুবিধা হলে আমার মনের অবস্থা : ....।

10. যেসব অসুবিধা আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি : ....।

11. যেসব অসুবিধা এখনও রয়ে গেছে : ....।

12. বন্ধুদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য আমি যা যা করি :.......................................।

স্নায়ু ও মনের স্বাস্থ্য

সার্বিক স্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে শারীরিক এবং মানসিক দু-ধরনের স্বাস্থ্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে, যা থেকে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এটা উলটোদিক থেকেও সত্যি।

মানসিক সমস্যার কারণ:

1. জন্মগত ত্রুটি - গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি, বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ জন্মের পর শিশুর মন ও বুদ্ধির বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে।
2. মানসিক চাপ - আশেপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির চাপ (বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনা) আমাদের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। অনেক সময় সেই মানসিক চাপ আমরা সহ্য করতে পারি না।
3. আমাদের বাড়ির অভ্যন্তরের নানা টানাপোড়েন।
4. মানসিক দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত নিতে না পারা।
5. নেশা।

ওপরের কারণগুলির জন্য কী কী সমস্যা হতে পারে তা জানার চেষ্টা করো :

1. ডিসলেক্সিয়া (পড়া বুঝতে মনে রাখতে আর লিখতে অসুবিধা হয়। অক্ষর চিনতে ও লিখতে, বানান মনে রাখতে, অঙ্কের হিসাব করতে, নানা তথ্য মনে রাখতে আর বুঝতে অসুবিধা হয়।)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

এসো দেখি নীচের কারণগুলো কী কী ধরনের মানসিক সমস্যা তৈরি করে -

রামের দাদার তুলনায় রাম অনেক দেরিতে হাঁটতে, চলতে, কথা বলতে শেখে।

রামের সমস্যা

লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাওয়া
নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল কাজে আগ্রহ হ্রাস
ডান-বাম চিনতে না পারা
নিজের কাজ করতে না পারা
সমাজে মানিয়ে চলতে না পারা
হতাশা ও অবসাদ

সমস্যাটি হলো মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

আয়েষা দু-বছর বয়স পর্যন্ত অন্য শিশুদের মতোই ছিল, তারপরে ওর বাবা -মা এই সমস্যাগুলো লক্ষ করতে থাকেন।

আয়েষার সমস্যা

একই কাজ বারবার করা
আত্মীয় পরিজনদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া
সামান্য উত্তেজনাতেও অতিরিক্ত সংবেদনশীল
অনেকসময় বেশি উত্তেজনাতেও সাড়া দেয় না
অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে না
পড়াশোনায় পিছিয়ে যাওয়া

সমস্যাটি হলো অটিজম।

জোসেফের সমস্যা

ক্লাসে স্থিরভাবে বসতে পারে না।
সহপাঠীদের ক্রমাগত বিরক্ত করে।
একই কাজে বা খেলায় মনোনিবেশ করতে পারে না।
বাড়িতেও একই সমস্যা চলতে থাকে।
রেগে গিয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

অফিস থেকে ফেরার পর জোসেফের বাবা প্রায়ই ভীষণ রেগে থাকেন ও কারণে-অকারণে ওকে মারধর করেন।

সমস্যাটি হলো মনোযোগহীনতা।

তানিয়া ও রোহনের সমস্যা

ক্রমাগত উদবেগে ভোগা।
শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি।
উদ্যোগহীনতা।
উদবেগজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা।
কখনো-কখনো ভীষণ রেগে যাওয়া।

তানিয়া রোহন দুই ভাইবোন। মা বাবা ভীষণ কড়া। কখন এবং কেন শাস্তি পেতে হবে, সেই ভয়ে দুজন তটস্থ থাকে। ওরা মায়ের কাছে বসতে ভয় পায়। পারতপক্ষে চোখে চোখ রেখে কথা বলে না। তানিয়ার প্রায়দিনই রাতে ঘুম আসে না। খিদেও পায় না। রোহনের অবস্থা ঠিক তার উলটো।

সমস্যাটি হলো মানসিক উদবেগ।

সমীরের সমস্যা

বানান করে পড়তে অসুবিধা।
নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া।
পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব।
পড়াশোনার বাইরে কোনো একটা বিষয়ে অন্যদের তুলনায় বিশেষ পারদর্শী।

সমস্যাটি হলো পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া।

লিখতে এবং অঙ্ক করতে সমীরের ভীষণ অসুবিধা

রতনের সমস্যা

খিদে খুব বেড়ে যাওয়া।
ঘুম বেড়ে যাওয়া।
প্রায় সময়েই কাঁদা।
মন খারাপ করে একা একা বসে থাকা।
সবসময় অসহায় বোধ করা।

সমস্যাটি হলো মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেসন।

সবসময় খেতে ও ঘুমোতে রতনের খুব ভালো লাগে।

মনোবিদ ও মনোচিকিৎসক

মনোবিদরা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেখভাল করেন। বিভিন্ন দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েনে আমরা মনোবিদদের সাহায্য নিই। তাঁরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা শনাক্তকরণ ও তার থেকে মুক্তির উপায় বাতলে দেন।

মনোচিকিৎসকদের কাজ প্রায় মনোবিদদেরই মতো। তবে অনেকসময় যেখানে ওষুধের দ্বারা মানসিক রোগ নিরাময় সম্ভব এবং যেখানে শারীরিক ও মানসিক অসুখ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেখানে মনোচিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আমরা যা কিছু করি:

1. ব্যবহারিক পরিবর্তন (কু-অভ্যাস শনাক্তকরণ ও দূরীকরণ)
2. মনোবল বৃদ্ধি (কোনো কুঅভ্যাস ছাড়ার জন্য মনের জোরকে বাড়িয়ে তোলা)
3. মনের কথা খুলে বলা।
4. বিতর্কিত ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করা।
5. ধ্যান ও একাগ্রতা বৃদ্ধি।
6. পাঠক্রম-বহির্ভূত ব্যাপারে চর্চা — ছবি আঁকা, গান, খেলাধুলা ইত্যাদি।

ওপরের বিষয়গুলি দেখে তুমি তোমার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কি কি করবে তার তালিকা তৈরি করো :

1. -- ।
2. -- ।
3. -- ।
4. -- ।
5. -- ।
6. -- ।

নীচের ছবিগুলো থেকে তুমি কোনগুলোকে বেছে নেবে তোমার রাগ কমানোর জন্য এবং কেন?

গান শোনা

ব্যায়াম করা

গান গাওয়া

বই পড়া

খেলা

মুখোমুখি কথা বলা

গানের তালে নাচা

বাগানের গাছে জল দেওয়া

প্রাণায়াম করা/ ধ্যান করা

রাগ কমানোর উপায়	রাগ কমানোর উপায়টি কেন বেছে নিলে

সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার

বায়ুবাহিত রোগ

সুস্থ তো আমরা সবাই থাকতে চাই। কিন্তু রোগ তাও আমাদের পিছু ছাড়ে না। তোমার পরিবারে বা পাড়ায় তুমি নিশ্চয়ই বিভিন্ন লোককে নানারকম রোগে ভুগতে দেখেছ। এমনকি তুমি নিজেও হয়তো কখনও অসুস্থ হয়েছ।

তোমার পরিবারের বা তোমার পাড়ায় তুমি কী কী রোগ দেখেছ তার একটা তালিকা তৈরি করো। একইসঙ্গে ওই রোগগুলি কীভাবে ছড়াতে পারে সেটা একটু ভেবে লেখার চেষ্টা করো তো।

রোগের নাম	কীভাবে ছড়ায়
1.সাধারণ সর্দিকাশি	1. বায়ুর মাধ্যমে
2. আমাশয়	2. জলের মাধ্যমে
3. ম্যালেরিয়া	3.
4.	4.
5.	5.

তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে, বিভিন্ন ধরনের রোগ বিভিন্নভাবে ছড়ায়— কখনও জল, কখনও বা বায়ু, আবার কখনও বা অন্য কোনো জীবের সাহায্যে।

অনিল আর খালেদ খুব বন্ধু, ক্লাসে পাশাপাশি বসে। খালেদের আজ সকাল থেকেই খুব হাঁচি হচ্ছে। আর সে বারেবারে হাত দিয়ে নাক মুছছে। অনিল আবার আজ বিজ্ঞানের বই আনেনি। বিজ্ঞান ক্লাসে তারা দুজনে গায়ে গা লাগিয়ে বসে খালেদের বই নিয়েই পড়াশোনা করল। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলায় অনিল খেয়াল করল যে তারও হাঁচি হচ্ছে আর নাক ভরে গেছে পাতলা সর্দিতে। অনিল বুঝল খালেদের সর্দির জীবাণু তার দেহেও প্রবেশ করেছে।

বসন্ত রোগের আক্রমণ

কানাডা ভূখণ্ডের দখল নিয়ে তখন লড়াই চলছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সেখানকার অধিবাসী ফরাসি আর স্থানীয় আমেরিকান আদিবাসীদের(ফ্রেঞ্চ-ইন্ডিয়ান ওয়ার : 1754-1763)। এখনকার পিটসবার্গে ফোর্ট পিট (Fort Pitt)-এ ব্রিটিশ সৈন্যদের আটকে রেখেছিল একদল আমেরিকান। ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড জেফ্রি

আমহার্স্ট আমেরিকানদের এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর কথামতো অবরুদ্ধ দুর্গের ক্যাপ্টেন সাইমন ইকুইয়েয়ার (Captain Simon Ecuyer) সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন আমেরিকান উপজাতির সর্দারের কাছে। আর সঙ্গে পাঠালেন দুটি কম্বল ও রুমাল। ওই কম্বলগুলো আসলে ছিল বসন্ত রোগ (Small Pox)-এ আক্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যবহার করা কম্বল। জেনারেল আমহার্স্ট চেয়েছিলেন এইভাবে আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে বসন্ত রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে। আর জেনারেলের উদ্দেশ্যও সফল হয়েছিল পুরোপুরি। অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকান উপজাতি সৈন্যদল বসন্ত রোগের ভয়াবহ সংক্রমণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ব্রিটিশরাও ফোর্ট পিটের দুর্গটি দখল করে নিল।

এতো গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু তোমরা কি বুঝতে পারলে বসন্ত রোগ কীভাবে ছড়ায়?

আরেকটা খবর তোমাদের জানাই, শুধু টিকাদানের মাধ্যমে 1977 সালের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে গুটি বসন্ত (Small Pox)-কে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছিল।

বায়ুর মাধ্যমে কীভাবে রোগ ছড়ায়?

বায়ুর মাধ্যমে রোগগুলো কীভাবে ছড়ায় বলতে পারবে কি? এসো তো সাধারণ সর্দি-কাশি কীভাবে ছড়ায় লিখে ফেলি।

সাধারণ সর্দি-কাশি কীভাবে ছড়ায়?	সাধারণ সর্দি-কাশি হয়েছে এমন ব্যক্তির কী কী করা উচিত যাতে ওই রোগটি না ছড়ায়?
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

বায়ুর মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ কীভাবে ছড়ায় এসো দেখা যাক।

কণা সংক্রমণ :

- হাঁচি বা কাশির সময়, জোরে কথা বলা বা থুতু ফেলার সময় রোগীর নাক আর মুখ দিয়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো তরল কণা (droplet) দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে আর বাতাসে ভাসতে থাকে।
- প্রত্যেক তরল কণাতে থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু।
- রোগজীবাণুভরা এই তরল কণা সুস্থ লোকের নাক আর মুখ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে।

ধুলো সংক্রমণ :

- হাঁচি বা কাশির সময় বা জোরে কথা বলার সময় রোগীর নাক আর মুখ দিয়ে ছোটো ছোটো তরল কণার সঙ্গে কিছু বড়ো বড়ো তরল কণাও দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে।
- এই তরল কণাগুলোতেও থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু।

- এই তরল কণাগুলো আকারে বড়ো হওয়ায় নিজেদের ভারে মাটিতে এসে পড়ে। আর শুকিয়ে যায়।
- এরপর এইসব রোগজীবাণু ধুলোর কণার সঙ্গে মিশে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। আর নাক ও মুখ দিয়ে এইসব রোগজীবাণু সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে।

পশু থেকে মানুষের দেহে এল রোগ :

কৃষি সভ্যতার তখন প্রথম যুগ। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে শিখে নিল পশুপালন। মানুষ আর পশু-পাখি পাশাপাশি থাকতে আরম্ভ করল। নিজের নানা কাজে সে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল পশুদের — পশুদের দুধ পান করা, তাদের চামড়া দিয়ে জামাকাপড়, জুতো তৈরি করা। আর পশুপাখিদের মলমূত্রের মধ্য দিয়ে তাদের নানা সংক্রামক অসুখ সঞ্চারিত হলো মানুষের দেহে।

ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির সময়ে খোদাই করা একটি পাথরে সম্ভবত পৃথিবীর যক্ষ্মা (TB) রোগের স্বীকৃত প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়। যক্ষ্মা সংক্রামক রোগ। নগরায়ন বা শিল্পায়নের সময় অনেক লোক যখন একসঙ্গে ছোটো জায়গায় থাকতে আরম্ভ করল, যক্ষ্মা নিল মহামারির আকার।

একই জায়গায় বহু লোকের একসঙ্গে উপস্থিতি বায়ুবাহিত রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আর শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে তোমার চেনা ডাক্তারবাবুর সাহায্যও নিতে পারো।

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	রোগের প্রতিকার
1. যক্ষ্মা	i.. একনাগাড়ে জ্বর ii. কাশি iii. থুতুর সঙ্গে রক্ত পড়া	i. স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী অসুখের চিকিৎসা করা দরকার। ii. যথেষ্ট জল পান করা দরকার। iii. পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। iv.
2. সাধারণ সর্দিকাশি	i. নাক দিয়ে জলের মতো পাতলা সর্দি ii. কাশি	i. ii. iii.
3. ইনফ্লুয়েঞ্জা	i. হাঁচি ও কাশি ii. গা, হাত, পায়ে ব্যথা iii. জ্বর iv.	i. ii. iii. iv.

কাঠের গুঁড়ো, ফুলের রেণু আর হাঁচি-কাশি

সেদিন স্কুলের মিড-ডে মিলে ডিমের তরকারি হয়েছে। অমিত বলল, আমি ডিম খাব না। ডিম খেলে আমার গায়ে লাল লাল দাগ বেরিয়ে যায়, হাঁচি হয়, কখনও বমিও হয়।

রফিক বলল, সে কী রে, তুই ডিম খেতে পারিস না। তাহলে তোর ডিমটা আমাকে দিস। তোর কী কষ্ট রে! অমিত বলল, ডাক্তারবাবু বলেছেন যে আমার ডিমে অ্যালার্জি আছে।

প্রেরণা বলল, অ্যালার্জি কী রে?

আয়েষা বলল, ঠিক জানি না। তবে জানিস তো আমারও না অমিতেরই মতো সমস্যা আছে। তবে ডিমে না, ধুলোয়। বাড়িতে বইপত্তর, লেপ-তোশকের ধুলো আমার নাকে গেলেই হাঁচি শুরু হয়, চোখ নাক জ্বালা করতে থাকে আর জল পড়ে।

তোমরাও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো। আর নিজেরাও ভেবে দেখো তো, তোমাদের কার কার এই ধরনের সমস্যা হয়। আর ওই সমস্যার মূলে কোন জিনিসটা দায়ী, সেটাও লিখে ফেলার চেষ্টা করো।

কী জিনিস থেকে সমস্যা	কী সমস্যা হয়েছিল	কী করে সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছিলে
1. ডিম খেলে		
2. ধুলো নাকে গেলে		
3.		
4.		

বিভিন্ন বস্তুর কাছাকাছি এলে বা খেলে তোমাদের দেহে যে নানারকম সমস্যা (গায়ে লাল লাল দাগ, হাঁচি, চোখ নাক জ্বালা করা, বমি ইত্যাদি) দেখা যায়, সেটাই হলো **অ্যালার্জি**। আর যেসব বিভিন্ন বস্তু তোমাদের দেহে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে, তারাই হলো **অ্যালার্জেন**। কয়েকটি অ্যালার্জেন হলো ডিম, ধুলো,.............., ... , ... ।

বায়ুবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণভাবে কী কী করা উচিত এসো তো লিখে ফেলি।

বায়ুবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায়
1. অসুস্থ অবস্থায় হাঁচি/ কাশির সময় মুখে আর নাকে রুমাল চাপা দেওয়া।
2. যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা।
3.
4.

বায়ুবাহিত আরো কিছু রোগ সম্বন্ধে জেনে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

রোগের নাম	জীবাণুর প্রকৃতি (ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া)	লক্ষণ	প্রতিকার	কীভাবে এই রোগটি সম্বন্ধে জানলে

কিছু বায়ুবাহিত রোগ আর তাদের জীবাণু। নীচের সারণিতে দেওয়া জীবাণুর ছবিগুলো অনেকগুণ বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

রোগের নাম	জীবাণুর ছবি	জীবাণুর প্রকৃতি
1. সাধারণ সর্দিকাশি	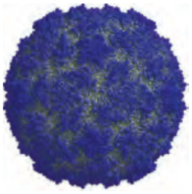	ভাইরাস
2.যক্ষ্মা		ব্যাকটেরিয়া

জলবাহিত রোগ

প্রথম তিনটে ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ? ....।

শেষ দুটো ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ? ....।

ছবিগুলো একসঙ্গে দেখে তোমার কী মনে হলো? ....।

আসলে ওপরের ছবিগুলোতে যেসব খাদ্য বা পানীয়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের প্রধান উপাদান হলো জল। অনেকসময় ওইসব খাদ্য বা পানীয় তৈরি করতে বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করা হয় না। আর ওই দূষিত জল থেকেই আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে কলেরা, টাইফয়েডের মতো বিভিন্ন রোগের জীবাণু। তার ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

তোমার কি কখনও এই রকম অসুখ হয়েছিল? কী হয়েছিল আর কীভাবে সেরেছিল সেটাও নীচের সারণিতে লেখো।

কবে হয়েছিল	কী সমস্যা হয়েছিল	কীভাবে অসুখ সেরেছিল

কলেরা রোগের ইতিহাস

বিসূচিকা বা কলেরা রোগের সঙ্গে ভারতের পরিচয় প্রায় 2500 বছরের।

বাংলায় 1817 সালে কলেরা মহামারি দেখা দেয়। বঙ্গোপসাগরে চলাচল করা ব্রিটিশ জাহাজের মাধ্যমে বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছে যায় এই মহামারি। তারপর এই মহামারি সেখান থেকে পারস্য, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

2010 সালেও সারা পৃথিবীতে কলেরার শিকার হয়েছিল প্রায় 1,00,000 - 1,30,000 মানুষ। আর প্রায় 30-50 লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

1827 সালে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা, কলকাতা আর তার আশপাশের অঞ্চল থেকে দ্বিতীয় কলেরা মহামারির সূচনা। এরপর এই মহামারি গঙ্গার উজান বেয়ে লাহোর আর পাঞ্জাবে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে উটের ক্যারাভানের পথ ধরে কাবুল, আফগানিস্তান, বুখারা হয়ে রাশিয়ায় ছড়িয়ে যায় এই মহামারি। 1835 সালের মধ্যে এই মহামারি আমেরিকা আর ইউরোপে পৌঁছে যায়।

1900 থেকে 1920 সালের মধ্যে এই রোগে ভারতে আনুমানিক 80 লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

কলেরা রোগ আর কলেরা রোগী

কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির বারেবারে বমি আর মলত্যাগ। মলের রং চাল ধোয়া জলের মতো। মলে কোনো দুর্গন্ধ থাকে না।

রোগীর শরীর থেকে দিনে 10–11 লিটারের মতো জল (আর নুন) বেরিয়ে যায়। শরীর থেকে এতটা জল আর নুন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাত পায়ে সূঁচ ফোটানোর মতো অনুভূতি হয় - এর থেকেই **বিসূচিকা-র সূচিক** কথাটার উৎপত্তি।

এই রোগে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি শিশু আর বয়স্কদের, যাদের শরীর এই অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার ধকলটা নিতে পারে না।

বমি, পায়খানা, জল-তেষ্টা, পেট-ব্যথা, অবসন্ন বোধ করা, পায়ের চামড়ার শিথিলতা বা চামড়া কুঁচকে যাওয়া, রোগীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়া, জ্ঞান হারানো আর সবশেষে মৃত্যু। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগে খুবই অল্প — কখনও বা মাত্রই 24–48 ঘন্টা।

জানো কি কলেরা রোগের পিছনে কে রয়েছে?

জল

জল সংক্রমণ থেকেই ছড়ায় কলেরা রোগ।

প্রতি ৪ সেকেন্ডে এই গ্রহে একজনের মৃত্যু হচ্ছে জল সংক্রমণের কারণে।

জল আমরা কী কী কাজে ব্যবহার করি চট করে লিখে ফেলো।

জলের ব্যবহার	ওই জলে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে থাকলে আমাদের কী কী ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?
i) পানীয় জল হিসাবে	i)
ii) জামাকাপড় কাচতে	ii)
iii)	iii)

নীচের সারণিতে দেখো জলের বেশ কিছু উৎসের নাম লেখা আছে। এদের মধ্যে কোন কোন উৎসের জলকে তুমি পানীয় জল হিসাবে বেছে নেবে? আর কোনগুলোকেই বা তুমি পানীয় জল হিসেবে বেছে নেবে না? তোমার মতামতের পেছনে যে কারণগুলো আছে সেটাও নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজন মনে করলে, তুমি আরও কয়েকটা উৎসের নাম নীচের সারণিতে যোগ করতে পারো। এই সারণি পূরণ করার সময় তোমরা আগের পাতার ছবিগুলোর সাহায্য নিতে পারো।

জলের উৎস	পানীয় জল হিসাবে বেছে নেবে কি?	পানীয় জল হিসাবে বেছে না নেওয়ার কারণ	পানীয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এমন জল পান করলে কি সমস্যা হতে পারে?
1. নদী	গ্রহণযোগ্য নয়	কলকারখানার বর্জ্য বস্তু, জন্তু-জানোয়ারের মৃতদেহ ফেলা হয়।	
2. পুকুর			
3. কুয়ো			
4. নলকূপ/টিউবওয়েল			
5. মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশনের জল			
6. ফোটানো জল			
7. ফিলটার/পরিশুদ্ধ করা জল			
8.			
9.			

ওপরের তালিকাটা থেকে তোমরা তাহলে বুঝতে পারলে যে পানীয় জলের উৎস ঠিক হওয়াটা কতটা জরুরি। পানীয় জলের বিভিন্ন উৎসে নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ এসে মেশে। তেমনই আমাদের অসাবধানতার জন্য নানা রোগের জীবাণুও অনেক সময় পানীয় জলে এসে মেশে আর সেই জলের মাধ্যমেই ছড়ায়। জলের মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় তারাই হলো **জলবাহিত রোগ**।

জলের মাধ্যমে ছড়ায় এমন বিভিন্ন রোগে তুমি নিজেও হয়তো কখনও ভুগেছ। এমনও হতে পারে, তুমি নিজে না ভুগলেও তোমার পরিবারে বা পাড়ায় হয়তো কাউকে এই রোগে ভুগতে দেখেছ। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বা তোমার বাড়ির/পাড়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে পরের পাতার কর্মপত্রটি পূরণ করার চেষ্টা করো।

কর্মপত্র

1. তোমার নাম :

2. তুমি নিজে বা তোমার বাড়ির কেউ কখনও জলবাহিত রোগে ভুগেছ? কবে ভুগেছ?

....

....।

3. ওই রোগের লক্ষণ কী কী ছিল?

i)

ii)

iii)

4. ওই রোগ সারাতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

i)

ii)

iii)

5. কতদিন লেগেছিল ওই রোগ সারতে?

....

....।

6. ডাক্তার দেখিয়েছিলে কি? দেখিয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ওই রোগের কী নাম বলেছিলেন ?

....

....।

7. আগে থেকে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ওই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত বলে তোমার মনে হয়।

i)

ii)

iii)

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে আমাদের সুস্থ নীরোগ জীবনযাপনের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল কতটা প্রয়োজন। আর সেটা না হলেই আমরা নানারকম রোগের কবলে পড়তে পারি।

বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগ ও তার লক্ষণ

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আর শিক্ষিক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের পাতার সারণিটি ভরতি করো। প্রয়োজনে তোমার চেনা ডাক্তারবাবুর সাহায্যও নিতে পারো।

রোগের নাম	লক্ষণ	প্রতিকার
1. কলেরা	i. বারেবারে পাতলা জলের মতো মল ত্যাগ; মলের রং চাল ধোয়া জলের মতো ii. বমি iii. হাত ও পায়ে সূঁচ ফোটানোর মতো অনুভূতি	i. জল পান করে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জলের ঘাটতি পূরণ করা। ORS (Oral Rehydration Solution) পান করানো। ii. বিশুদ্ধ/ফোটানো জল পান করা iii. iv.
2. সাধারণ ডায়ারিয়া	i. বারেবারে খড়-ধোয়া জলের মতো মল ত্যাগ ii. শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া	i. ii.
3. পোলিও	i. হাত পায়ের মাংসপেশির অস্বাভাবিক শিথিলতা সমেত পক্ষাঘাত (Flaccid Paralysis) ii. ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া iii. জ্বর (উচ্চ তাপমাত্রা)	i. পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।

জলবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচতে সাধারণভাবে কী কী করা উচিত এসো লিখে ফেলি।

জলবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায়
i) বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করা ।
ii) মাটির নীচে আর ছাদের ওপরের জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা।
iii)
iv)
v)
vi)

জলবাহিত আরো কিছু রোগ সম্বন্ধে জেনে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক/ শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

রোগের নাম	জীবাণুর প্রকৃতি ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া	লক্ষণ	প্রতিকার	কীভাবে এই রোগটি সম্বন্ধে জানলে

কিছু জলবাহিত রোগ আর তাদের জীবাণু। নীচের সারণিতে দেওয়া জীবাণুর ছবিগুলো অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

রোগের নাম	জীবাণুর ছবি	জীবাণুর প্রকৃতি
1. কলেরা		ব্যাকটেরিয়া
2. সাধারণ ডায়ারিয়া		ভাইরাস
3. পোলিও	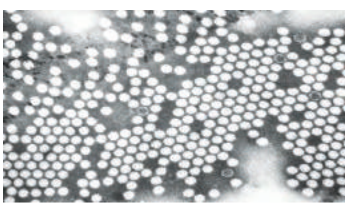	ভাইরাস

রোগ সংক্রমণে বাহকের ভূমিকা ও প্রতিকার

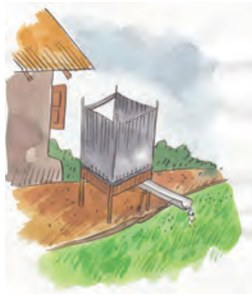

ওপরের ছবিগুলোতে যে যে বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে, তার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

বিষয়	কারণ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

ম্যালেরিয়া রোগটি কে ছড়ায় লেখো : ....।

ম্যালেরিয়া রোগটার কথা তো তোমরা প্রায়ই শোনো। এবারে এসো তোমাদের ম্যালেরিয়া রোগের একটা গল্প শোনাই।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জীবাণুর বেড়ে ওঠার জন্য চাই একটা জীবদেহ। আর ঠিক এই কারণেই সেই জীবাণুদের সঙ্গে মশার পরিচয় হয় আজ থেকে প্রায় 30 কোটি বছর আগে। আজকের মতো মানুষ তখন পৃথিবীতে কোথায়! আজকের মতো মানুষ এসেছিল তার অনেক পরে — আজ থেকে মাত্র এক লক্ষ 30 হাজার বছর আগে।

বংশবৃদ্ধির জন্য মশার দেহ ছাড়াও ম্যালেরিয়া জীবাণুর চাই আরেকটা প্রাণীর দেহ। প্রায় 100-র বেশি বিভিন্ন প্রজাতির ম্যালেরিয়া জীবাণু, সাপ থেকে আরম্ভ করে পাখি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ম্যালেরিয়া জীবাণুর মাত্র চারটি প্রজাতি ছাড়া আর অন্য কোনো প্রজাতি মানুষকে তাদের বংশবৃদ্ধির নিয়মিত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনি। এই ফাঁকে তোমাদের ম্যালেরিয়া জীবাণুর একটা প্রজাতির নাম জানিয়ে রাখি — *Plasmodium vivax*। মানুষের রক্ত পরীক্ষা করলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে লোহিত রক্তকণিকায় এই জীবাণুগুলো দেখা যায়।

প্লাসমোডিয়াম যে মশা আর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে আশ্রয় নেয়, তারা হলো **পোষক**।

এই পোষকদেরও আবার রকমফের আছে। প্লাসমোডিয়াম জীবাণু বেঁচে থাকার জন্য মশা ও অন্য আর একটা মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন- মানুষ) ওপর নির্ভরশীল। মশার দেহে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। আবার মানুষ বা অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে এরা বেড়ে ওঠে। তাই মশা হলো **মুখ্য** বা **নির্দিষ্ট পোষক** আর মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হলো **গৌণ** বা **অন্তর্বর্তী পোষক**।

ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মানুষের চেনা জানা

আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ ভবঘুরে জীবন ছেড়ে কৃষিজীবনে প্রবেশ করে। তখন থেকেই ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। কী এমন হলো যে প্লাসমোডিয়ামের হামলায় মানুষ কাবু হয়ে পড়ল— নীচে লেখার চেষ্টা করো দেখি।

ভবঘুরে জীবন ছেড়ে মানুষ কৃষিজীবন আরম্ভ করার সঙ্গে প্লাসমোডিয়ামের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

1. মানুষ দল বেঁধে একসঙ্গে একজায়গায় দীর্ঘদিন থাকতে আরম্ভ করল।
2.
3.
4.

ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় হয় আফ্রিকায়। পরের দিকে খাবার আর থাকার জায়গার খোঁজে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আর মানুষ তার নিজের শরীরে বহন করে নিয়ে চলল ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে। আফ্রিকা থেকে ম্যালেরিয়া, ইউরোপে আর গোটা এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোও ম্যালেরিয়ার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। তুষার যুগে আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে সাইবেরিয়া থেকে আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হয়েছিল ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া।

1600 সালে পেরুর পাদরি জুয়ান লোপেজ, আবার কারোর কারোর মতে 1633 সালে কালাঞ্চা সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়া জ্বর সারানোর ওষুধ আবিষ্কার করেন।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ তো আবিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ম্যালেরিয়া জীবাণুকে তখনও কেউ চোখে দেখেনি। 1880 সালের 24 ডিসেম্বর ফরাসি সামরিক বাহিনীর ডাক্তার চার্লস লুই আলফাঁসো লাভেরাঁ আলজেরিয়ায় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু খুঁজে পান।

ম্যাপে পৃথিবী জুড়ে ম্যালেরিয়ার যাত্রা পেন বা পেনসিলের সাহায্যে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখাও।

ম্যালেরিয়া যে মশাবাহিত রোগ, তার প্রমাণ দিলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর এক ডাক্তার — **রোনাল্ড রস।** 1897 সালের 20 আগস্ট সেকেন্দ্রাবাদে স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার পাকস্থলীতে তিনি ম্যালেরিয়া জীবাণুর সন্ধান পান। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে (বর্তমান SSKM হাসপাতাল) গবেষণার বাকি কাজটুকু শেষ করেন। তাঁর এই কাজের জন্য রোনাল্ড রস 1902 সালে নোবেল পুরস্কার পান।

আচ্ছা আরও কয়েকটি রোগের নাম লেখার চেষ্টা করো, যে রোগগুলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো না কোনো জীবের ভূমিকা আছে। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নিতে পারো।

রোগের নাম	রোগ ছড়ানোতে যে জীবের ভূমিকা আছে
1. ম্যালেরিয়া	
2. ডেঙ্গু	
3. টাইফয়েড	
4. প্লেগ	
5. কলেরা	
6.	
7.	
8.	

প্লেগ - ব্ল্যাক ডেথ

Ring-a-ring of roses,
A pocket full of posies,
A-tishoo! A-tishoo!
We all fall down.

এইরকম একটা ছড়া তোমরা অনেকে হয়তো শুনেছো। কিন্তু তোমরা কী জানো যে ওই ছড়াটা লন্ডনের চতুর্দশ শতাব্দীর প্লেগ মহামারিকে উপলক্ষ করে লেখা হয়েছিল। প্লেগ তার ধ্বংসাত্মক মারণলীলার জন্য সে দেশে ব্ল্যাক ডেথ নামে বেশি পরিচিত। ঠিক যেমন যক্ষ্মাকে একসময় ডাকা হতো হোয়াইট ডেথ নামে। কিন্তু ব্ল্যাক কেন? কারণ আর কিছুই নয়, প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তির সারা গায়ে কালো কালো ছোপ দেখা যায়।

কিন্তু নানাধরনের প্রাণীর মাধ্যমে ছড়ানো রোগের কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্লেগের কথা কেন? তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ যে কোনো একটা প্রাণী নিশ্চয়ই এই রোগ ছড়ানোয় সাহায্য করে। কে বলত? ইঁদুর। প্লেগ এত মারাত্মক যে 541-542 খ্রিস্টাব্দে 10 কোটি মানুষের প্রাণ নিয়েছিল প্লেগ। আর 541 থেকে 700 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যা হ্রাস পায় 50 শতাংশ। ভারতবর্ষও প্লেগের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। অতীতে প্লেগের জীবাণুর আক্রমণে ভারতেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বারবার আক্রমণ করলেও প্লেগ কিন্তু ইউরোপের মাটিতে চিরকালের জন্য থেকে যেতে পারেনি। কারণ প্লেগের আন্যতম বাহক, মেঠো কালো ইঁদুর শীতের দেশের বাসিন্দা নয়। বিষুবরেখার আশেপাশের দেশে এদের বাস। মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় প্রায় 8 থেকে 10 হাজার বছর আগে মানুষ যখন প্রথম চাষবাস করতে শিখেছিল তখন থেকে। উর্বর মাটিকে শস্য উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছিল মানুষ। নিয়মিত খাবারের জোগান পাবার আশায় ক্ষেতের মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছিল কালো মেঠো ইঁদুরের দল। এই মেঠো ইঁদুরের চামড়ায় বাসা বাঁধে এক ধরনের উকুন । আর প্লেগের জীবাণু আশ্রয় নেয় এই উকুনের পাকস্থলীতে।

কিন্তু কীভাবে ছড়ায় এই প্লেগ?

এই জীবাণুগুলো খুব তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বেড়ে ইঁদুরের উকুনের (Rat flea) পাকস্থলীর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ফলে উকুনটা অনাহারে, খিদের জ্বালায় থাকে সামনে পায়, তাকেই কামড়ায়। আর সেই ক্ষতস্থানে প্লেগের জীবাণু বমি করে দেয়। সেই ক্ষতস্থান থেকে প্লেগের সংক্রমণ ঘটে। ইঁদুরের উকুন ইঁদুরকে কামড়ালে ইঁদুরে, আর মানুষকে কামড়ালে মানুষে প্লেগের সংক্রমণ হয়। বস্তাবন্দি চাল, গম, আলুর সঙ্গে প্লেগের মেঠো ইঁদুর গ্রাম থেকে পৌঁছোয় শহরে। আর বন্দর থেকে জাহাজে করে দূরদূরান্তের দেশে পাড়ি দেয়। আর ইঁদুরের এই দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার পথ ধরেই ছড়িয়েছে প্লেগ। একবার নয়, বারবার।

1899 সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারির আকার ধারণ করে। প্রতিদিনই বহু মানুষ মারা যেতে থাকেন। এইসব দেখে ভগিনী নিবেদিতা আর স্থির থাকতে পারেননি । তিনি নিজের হাতে রাস্তাঘাট, নর্দমা পরিষ্কার করার দায়িত্ব তুলে নেন। প্লেগে আক্রান্ত মানুষদের নিজের হাতে সেবা করতে থাকেন। তাঁর এই কাজে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যুবসমাজও তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভগিনী নিবেদিতা একটা কমিটি তৈরি করেন। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়ে এই সমাজসেবকরা প্লেগের রোগীদের সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেন।

মশা-মাছি আর বিভিন্ন রোগ

মশা

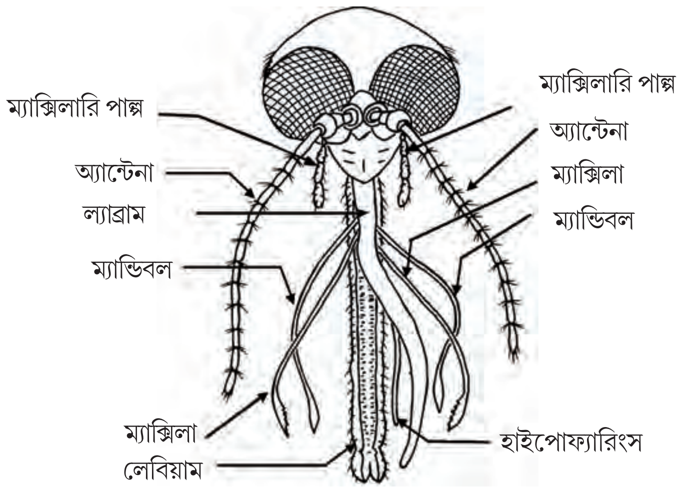

খাবার খাওয়ার জন্য আমরা আমাদের দেহের কী কী অঙ্গ ব্যবহার করি তোমরা তো জানো। এবারে এসো দেখি মশা কীভাবে রক্ত পান করে।

মানুষের খাওয়া		মশার রক্তপান করা	
অঙ্গের নাম	কীভাবে সাহায্য করে	অঙ্গের নাম	কীভাবে সাহায্য করে
1.ঠোঁট	1.	1. লেবিয়াম	1. বাকি দংশক অংশকে ঢেকে রাখে; রক্ত পান করার সময় পেছন দিকে সরে গিয়ে মুখের বাকি অংশকে চামড়া ভেদ করতে দেয়।
2.দাঁত	2.	2. ম্যান্ডিবল	2. সূঁচের মতো অংশ; চামড়া ফুটো করতে সাহায্য করে।
3. জিভ	3.	3. ম্যাক্সিলা	3. ছুরির মতো অংশ; চামড়া ভেদ করতে সাহায্য করে; রক্ত পান করার সময় মশার বাকি দংশক অংশকে অবলম্বন দেয়।
4.	4.	4. হাইপোফ্যারিংস	4. মশা যে ব্যক্তির রক্ত পান করছে সেই ব্যক্তির দেহে নিজের লালারস প্রবেশ করায়, যাতেরক্ত জমাট না বাঁধে।
5.	5.	5. ল্যাব্রাম	5. প্রধান রক্ত-চোষক নল; এর মাধ্যমে মশা রক্তপান করে।

মশার বিভিন্ন মুখ-উপাঙ্গগুলো তাদের বিশেষ খাদ্যাভ্যাসের জন্য পরিবর্তিত হয়ে **প্রোবোসিস** গঠন করে। এসো এবারে দেখে নিই প্রোবোসিস কীভাবে কাজ করে।

জানার চেষ্টা করা যাক আমাদের চেনা মশা কীভাবে রোগ ছড়ায়?

- মশার দেহে একটা লম্বা, ফাঁপা নলের মতো প্রোবোসিস থাকে। স্ত্রী মশার ক্ষেত্রে প্রোবোসিসটি হয় সরু আর তীক্ষ্ণ, অনেকটা ইনজেকশানের সূঁচের মতো। কিন্তু পুরুষ মশার প্রোবোসিসটি ভোঁতা।
- স্ত্রী মশা তার সূঁচের মত তীক্ষ্ণ প্রোবোসিস দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া ভেদ করে রক্ত পান করে। পুরুষ মশার প্রোবোসিসটা ভোঁতা হওয়ায়, তারা কেবল উদ্ভিদের বিভিন্ন রস যেমন- ফুলের রস, ফলের রস ইত্যাদি পান করে।
- কোনো প্রাণীর রক্ত পান করার সময় স্ত্রী মশা প্রোবোসিসের মধ্যে দিয়ে তার লালা প্রাণীটির দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়। কারণ আর কিছুই নয় যাতে রক্ত পান করার সময় রক্ত জমাট না বাঁধে।
- এই লালার সঙ্গেই স্ত্রী মশার দেহে বাসা বাঁধা রোগের জীবাণু ওই প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে।

মশা কীভাবে রোগ ছড়ায়, সেটা তো আমরা জানলাম। এবারে এসো আমরা দেখে নিই মশার রকমভেদ। আর জেনে নিই কোন মশা কী রোগ ছড়ায়।

নীচের সারণিতে বিভিন্ন ধরনের মশার বৈশিষ্ট্য (চেনার উপায়) আর মশা থেকে ছড়ায় এমন রোগের নাম লেখা আছে। এই তিন ধরনের ছাড়াও আর অন্য কোনো ধরনের মশার কথা তুমি কি জানো? নীচের সারণিতে তাদের কথাও লেখো।

মশা	ছবি	চেনার উপায়/বৈশিষ্ট্য	কী রোগ ছড়ায়
1. অ্যানোফিলিস		1. ডানায় কালো ছোপ থাকে। 2. বিশ্রামের সময় সমতলের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে বসে। 3. ওড়বার সময় ডানায় শব্দ হয়। 4. সন্ধ্যার সময় বাইরে বেরোয়। 5. পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে।	1. ম্যালেরিয়া
2. কিউলেক্স		1. ডানায় কোনো ছোপ থাকে না। 2. বিশ্রামের সময় সমতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বসে। 3. ওড়বার সময় ডানায় শব্দ হয় না। 4 রাত্রে বাইরে বের হয়। 5. এরা নোংরা ও ময়লা জলে ডিম পাড়ে।	1. গোদ/ ফাইলেরিয়া 2. এনকেফালাইটিস

মশা	ছবি	চেনার উপায়/বৈশিষ্ট্য	কী রোগ ছড়ায়
3. এডিস		1. পেটে আর পায়ে সাদা-কালো ডোরা থাকে 2. বিশ্রামের সময় সমতলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বসে । 3. ওড়বার সময় ডানায় শব্দ হয় না। 4. দিনের বেলায় বাইরে বের হয়। 5. পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে।	1. ডেঙ্গু 2. চিকুনগুনিয়া
4.			
5.			

বিভিন্ন ধরনের মশা আর তারা কী কী রোগ ছড়ায়, সে সম্বন্ধে তোমরা জানলে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় নীচের সারণিতে লিখে ফেলো তো। প্রয়োজনে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো বা শিক্ষক/শিক্ষিকা আর বাড়ির বড়োদের সাহায্য নাও।

মশা নিয়ন্ত্রণের উপায়
1. চৌবাচ্চা, বালতি, ফুলদানি ইত্যাদি জায়গার জল 2-3 দিন অন্তর পালটাতে হবে।
2. মশার লার্ভা খায় এমন মাছ (গাপ্পি, তেচোখা, শোল, ল্যাটা, গাম্বুসিয়া ইত্যাদি) জমা জলে ছাড়তে হবে।
3. নালা, নর্দমার বন্ধ নোংরা জলে পোড়া মবিল, কেরোসিন, ডিজেল ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এমনকি ব্লিচিং পাউডারও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।
4.

মশা কীভাবে রোগ ছড়ায়, সেটা তো আমরা জানলাম। এবার এসো আমাদের আরেকটা চেনা প্রাণী, মাছি, কীভাবে রোগ ছড়ায় সেটা জানি। তার আগে জেনে নিই মাছিদের বংশ পরিচয়।

মাছি

মাছিদের রকমফের

এবারে এসো দেখা যাক মাছির রকমফের।

মাছি	ছবি	চেনার উপায়/ বৈশিষ্ট্য	কি রোগ ছড়ায়
1.সাধারণ মাছি		1. ধূসর রঙের বুক। 2. পিঠে 4টে লম্বা কালো দাগ। 3. সারা দেহে রোমে ঢাকা। 4. দিনের বেলায় বাইরে বেরোয়। রাতে নিষ্ক্রিয় থাকে।	1. টাইফয়েড 2. ডায়ারিয়া

মাছি	ছবি	চেনার উপায়/ বৈশিষ্ট্য	কি রোগ ছড়ায়
2. বালি মাছি		1. মশার চেয়ে আকারে ছোটো 2. দেহ অত্যন্ত রোমশ 3. পাগুলো সরু ও লম্বা 4. সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোয়।	1. কালাজ্বর 2. বালিমাছি জ্বর
3. কালো মাছি		1. কালো রঙের মাছি 2. প্রোবোসিস আকারে ছোটো দাঁতওয়ালা ছোরার মতো। 3. দেহ মোটাসোটা। 4. ডানা দুটো চওড়া। 5. দিনের বেলায় দল বেঁধে বেরোয়। সবচেয়ে সক্রিয় হয় ভোরে আর সন্ধ্যের একটু আগে।	1.অঙ্কোসারকিয়াসিস

মাছি কীভাবে রোগ ছড়ায় ?

সাধারণ মাছি তিনভাবে রোগ ছড়ায়।

- সাধারণ মাছি যখন মল, মূত্র, পুঁজ, থুতু ইত্যাদি জিনিসে বসে, তখন ওইসব জিনিসের ছোটো ছোটো কণা মাছির পায়ে, শুঁড়ে লেগে যায়। ওই কণাগুলির ভেতরে থাকে অসংখ্য রোগজীবাণু। ওই মাছি যখন রান্না করা খাবার, মিষ্টি, কাটা ফল ইত্যাদির ওপর বসে তখন রোগজীবাণু ওই খাবারে মিশে যায় আর রোগ সংক্রমণ ঘটায়।

- মল, পুঁজ, থুতু ইত্যাদি জিনিসে থাকা রোগজীবাণুগুলো সাধারণ মাছির পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে জমে। মাছি আবার কঠিন খাবার খেতে পারে না। তাই মাছি কঠিন খাবারের ওপরে বমি করে। ফলে খাবারের কিছু অংশ তরল হয় আর মাছি তার প্রোবোসিসের সাহায্যে ওই খাবার গ্রহণ করে। ওই বমির সঙ্গে মাছির দেহের রোগজীবাণু আমাদের খাবারে এসে মিশে সংক্রমণ ঘটায়।

- সাধারণ মাছি সারাদিন ধরে প্রায় 5 মিনিট অন্তর অন্তর যেখানে বসে, সেখানে মলত্যাগ করে। মাছির মলেও অনেক জীবাণু থাকে। আমাদের খাবারের ওপরে মাছি মলত্যাগ করলে ওইসব রোগজীবাণু আমাদের খাবারে এসে মেশে।

মাছি কীভাবে রোগ ছড়ায়, তার একটা ধারণা তোমার পেলে। আর মশা কীভাবে রোগ ছড়ায় সেটাও তোমরা জেনেছ। ম্যালেরিয়ার গল্পটাও তো পড়েছ। বলো তো মশা আর সাধারণ মাছির রোগ সংক্রমণের মধ্যে তুমি কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলে?

মশা	সাধারণ মাছি
1.	1. সাধারণ মাছির দেহে রোগজীবাণু বংশবৃদ্ধি করে না।
2.	2.

কী বুঝলে ? সাধারণ মাছি তাহলে খালি রোগজীবাণুটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। তাই সাধারণ মাছি হলো — **যান্ত্রিক বাহক** (Mechanical vector)।

আর মশা রোগজীবাণুটিকে তার নিজের দেহে বংশবৃদ্ধি করতে দেয়। তাই মশা হলো — **জৈব বাহক** (Biological vector)।

দেখো তো এইরকম আরো কিছু জৈব আর যান্ত্রিক বাহকের নাম মনে করতে পারো কিনা। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

তাহলে এবারে জৈব বাহক আর যান্ত্রিক বাহকের মধ্যে কয়েকটা পার্থক্য লিখে ফেলো তো।

জৈব বাহক	যান্ত্রিক বাহক
1.	1.
2.	2.
3.	3.

বিভিন্ন ধরনের মাছি আর তারা কী কী রোগ ছড়ায় সেটা তো জানলাম। এমনকি এরা কীভাবে রোগ ছড়ায় সেটাও জানলাম। এবারে এসো, মাছিকে আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারি সেটা জানার চেষ্টা করি। কয়েকটি উপায় লিখে দেওয়া আছে। তুমি দেখো তো, আরো কয়েকটা উপায় লিখতে পারো কিনা।

মাছি নিয়ন্ত্রণের উপায়
1. যে-কোনো ধরনের খাবার সবসময় ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত।
2. ঘরের মেঝে/খাওয়ার জায়গা প্রতিদিন ফিনাইল দিয়ে মোছা।
3.
4.
5.

খাদ্যবাহিত রোগ ও প্রতিকার

নষ্ট হওয়া খাবার

(a) ওপরের ছবিতে দেওয়া ফল দুটোর মধ্যে কোনটা তুমি খাবে? ....।

(b) অন্য ফলটাকে বেছে না নিয়ে কেন ওই ফলটাকে তুমি বেছে নিলে? ....।

(c) অন্য ফলটা খেলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো কি? কী ক্ষতি হতে পারতো বলে তোমার মনে হয়? .... ।

(a) ওপরের ছবিতে দেখানো পাঁউরুটিগুলোর মধ্যে কোন পাঁউরুটি তুমি খাবে? ....।

(b) অন্য পাঁউরুটিটা না বেছে তুমি ওই পাঁউরুটিটাকে বেছে নিলে কেন? ....।

(c) অন্য পাঁউরুটিটা খেলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো কি? কী ক্ষতি হতে পারত বলে তোমার মনে হয়? ....।

নানাধরনের খাবার পচে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হলো ওইসব খাবারে বিভিন্ন অণুজীবদের আক্রমণ। সাধারণত এইসব অণুজীবেরা হলো ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাক।

কী কী ধরনের খাবার তোমরা পচে যেতে বা নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছ, তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলো।

পচে যায় এমন/নষ্ট হয়ে যায় এমন খাবার	কীভাবে বুঝলে খাবারটা নষ্ট হয়ে গেছে (রং বদল/বাহ্যিক চেহারার বদল/ বিশেষ গন্ধ/বিশেষ স্বাদ)
1. ফল :	
2. কাঁচা সবজি :	
3. মাছ/মাংস/ডিম :	
4. রান্না করা খাবার :	
5. অন্যান্য খাবার :	

যখন কোনো খাবারে বাসা বাঁধা অণুজীবরা সংখ্যায় বাড়ে তখন তারা নিজেদের শরীরে তৈরি উৎসেচক দিয়ে খাবারকে ভেঙে দেয়। আর ভেঙে যাওয়া খাবারের সরলতম অণুগুলো নিজেদের দেহে শোষণ করে নেয়।

ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ

নানাধরনের ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন ধরনের খাবারকে ভেঙে নানাধরনের অ্যাসিড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। খাবারে উপস্থিত এইসব ব্যাকটেরিয়া সবসময় যে ক্ষতিকারক হয় তা নয়। কিন্তু তাদের তৈরি করা ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো খাবারের বৈশিষ্ট্য বা স্বাদ বদলে দেয় বা খাবারটাকেই নষ্ট করে দেয়। এমনকি নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারের সঙ্গে ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো আমাদের শরীরে ঢুকলে অনেকসময় নানারকম রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে।

যেসব খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি (যেমন — মাংস, ডিম, মাছ, ডেয়ারিজাত খাবার) সেইসব খাবারে কিছু ব্যাকটেরিয়া সহজে জন্মায়। আবার কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কম প্রোটিনযুক্ত খাবারেও (যেমন - ফল, সবজি) জন্মায়, কিন্তু তারা কাজ করে তুলনায় অনেক ধীরে। ফলে রান্নাঘরে সাধারণ তাপমাত্রায় পেঁয়াজ বা কোনো ফল আর মাংস রেখে দিলে, মাংসতেই আগে পচন ধরার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কিন্তু এইসব ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও মারাত্মক হচ্ছে আরও অন্য কিছু ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যারা খাবারে কোনো খারাপ গন্ধ বা স্বাদ তৈরি করে না বা খাবারের চেহারায় কোনো বদল ও (যেমন হড়হড়ে ভাব, রং পালটে যাওয়া) আনে না। ফলে বাইরে থেকে দেখে বা খেয়েও হয়তো খুব একটা কিছু পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু এইসব ব্যাকটেরিয়া খাবারে বিষক্রিয়া ঘটায়, যা ডেকে আনতে পারে মারাত্মক সব অসুখ, অনেকসময় এমনকি মৃত্যুও। এদের সম্বন্ধে আমরা পরে জানব। আগে দেখে নিই, তোমরা যে পাঁউরুটিটা খেতে চাইলে না, সেটা খারাপ হয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ আছে।

ব্যাকটেরিয়া উপকারও করে

দই এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাবার তৈরিতে আমরা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিই। এছাড়াও স্ট্রেপটোমাইসেস ব্যাকটেরিয়ার কয়েকটি প্রজাতি থেকে জীবনদায়ী নানারকম ওষুধ আমরা পাই। গবাদি পশুদের পাকস্থলীতে কিছু ব্যাকটেরিয়া বাস করে যারা সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে সাহায্য করে। এছাড়াও মানুষের শরীরের অন্ত্রে বাস করে কিছু ব্যাকটেরিয়া যারা ভিটামিন B_{12} তৈরি করতে সাহায্য করে।

ছত্রাকের আক্রমণ

যে পাঁউরুটিটা তোমরা খেতে চাইলে না, ওই পাঁউরুটিটায় আক্রমণ করেছিল একধরনের ছত্রাক। এরাও অণুজীব। যেসব খাবারে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে, ছত্রাকরা সাধারণত সেইসব খাবারেই জন্মায়। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের আক্রমণের ফলে খাবারের বাহ্যিক চেহারা বা রঙের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়। এসো চিনে নিই খাবারে বাসা বাঁধা প্রধান কয়েক ধরনের ছত্রাককে।

Rhizopus প্রজাতির ছত্রাক

Penicillium প্রজাতির ছত্রাক

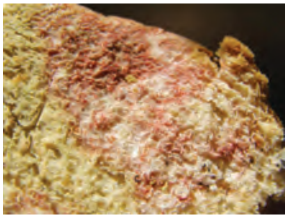

Neurospora প্রজাতির ছত্রাক

ছত্রাক উপকারও করে

পাঁউরুটি, চিজ, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় — এইসব তৈরি করতে অনেকসময় আমরা ছত্রাকের সাহায্য নিই। এক্ষেত্রে বেশি কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবারের প্রতি তাদের আকর্ষণই ওইসব জিনিস তৈরিতে সাহায্য করে। যেমন কয়েক ধরনের পেনিসিলিয়াম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরি হয়, পাঁউরুটি তৈরি করতে লাগে ইস্ট।

Claviceps প্রজাতির ছত্রাক

উৎসেচকের ক্রিয়া

অণুজীব ছাড়াও অন্য আর এক কারণেও খাবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেই কারণটা হলো উৎসেচকের ক্রিয়া। উদ্ভিদজাত বা প্রাণীজাত খাবার কোশ দিয়ে তৈরি। আর ওই কোশে থাকে নানাধরনের উৎসেচক। উদ্ভিদজাত বা প্রাণীজাত খাবারগুলো টাটকা অবস্থায় রান্না না করে ফেলে রাখলে উৎসেচকরা ওইসব খাবারের রং বা স্বাদে অনাকাঙ্খিত বদল আনতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও উৎসেচকের ক্রিয়ার জন্য খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এবারে এসো দেখা যাক কী কী করলে এই ধরনের নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার থেকে হওয়া রোগ আমরা এড়াতে পারি।

1. বাহ্যিক চেহারায় অস্বাভাবিক বদল এসেছে এমন ফল/সবজি না খাওয়া।
2. খারাপ স্বাদ বা গন্ধযুক্ত খাবার না খাওয়া।
3. কোনো কোনো খাবার থেকে জল বের করে দিয়ে (অর্থাৎ শুকিয়ে ফেলে) সেই খাবারকে অনেকদিন অবধি খাওয়ার যোগ্য রাখা যায়। যেমন, ...।
4. ....।
5. ....।

খাবারে পরজীবী প্রাণী আর জীবাণুর সংক্রমণ

(a) ওপরের ছবিতে দেওয়া মাংসগুলোর মধ্যে কোনটা তুমি খাবে? ....।

(b) কেন তুমি ওই মাংসটাকে খাওয়ার জন্য বেছে নিলে? ....।

(c) অন্য মাংসটাকে বেছে নিলে তোমার কি কোনো ক্ষতি হতো? ক্ষতি হলে কী ক্ষতি হতে পারত? ....।

পরজীবী থেকে রোগ

বিভিন্ন পশুর শরীরে অনেকসময় বাসা বাঁধে কৃমি জাতীয় কিছু প্রাণী। পশুর শরীরে সাধারণত আশ্রয় নেওয়া এই কৃমিরা হলো পরজীবী। পরজীবীরা আশ্রয় নিয়েছে এমন পশুর কাঁচা মাংস বা সঠিক তাপমাত্রার রান্না না করা মাংস খেলে ওইসব পরজীবীরা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। আর মানুষের শরীরে নানারকম রোগের সৃষ্টি করে।

এসো এবারে মানুষের শরীরে এইরকম কয়েকটা পরজীবী সংক্রমণ সম্বন্ধে জেনে নিই।

পশুর নাম	পরজীবীর প্রকৃতি	সংক্রামিত মাংস খেলে যে যে রোগ লক্ষণ দেখা যেতে পারে
1. গোরু	ফিতাকৃমি	পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, গা-বমিভাব, খাবারে অনীহা হতে পারে।
2. শুয়োর	ফিতাকৃমি	মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে গেলে মাথায় যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা, এমনকি মাঝে মাঝে কাঁপুনিও (seizure) হতে পারে।
	গোলকৃমি	মানুষের অন্ত্রে এই পরজীবীর সংখ্যা বেশি হলে গা-বমিভাব, ডায়ারিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

বার্ড ফ্লু

পাখিদের একধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে (H5N1) অনেকসময় পোলট্রির মুরগিরা আক্রান্ত হয়। এই বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত মুরগিদের লালারস, সর্দি বা মলের সংস্পর্শে এলে অন্য মুরগিরাও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাসে আক্রান্ত মুরগির চামড়া, মলমূত্র বা রক্তের সংস্পর্শে এলে মানুষও বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হতে পারে। বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত মুরগির কাঁচা মাংস খেলে বা ঠিক তাপমাত্রায় (70°C তাপমাত্রায় 30 মিনিট) রান্না না করা মাংস খেলেও বার্ড ফ্লু হতে পারে।

বার্ড ফ্লু হলে প্রথম দিকে জ্বর, গলা খুশখুশ, চোখে সংক্রমণ, বমি বা ডায়ারিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অবশেষে নিউমোনিয়া আর শ্বাসকষ্ট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ

পোলট্রিজাত খাবার (যেমন-ডিম, মাংস), কাঁচা সবজি, পাস্তুরাইজ না করা দুধে অনেকসময় জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। এইসব খাবার কাঁচা বা সঠিকভাবে রান্না না করে খেলে শরীরে নানারকম রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে।

এসো এইরকম কয়েকটা রোগজীবাণু আর তাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগ সম্বন্ধে জানি।

রোগের নাম	জীবাণুর প্রকৃতি	কীভাবে সংক্রমণ ঘটে
স্যালমোনেলোসিস	ব্যাকটেরিয়া	কাঁচা বা সঠিকভাবে রান্না না করা পোলট্রিজাত খাবার থেকে; বর্জ্য বস্তুর সাহায্যে ফলানো সবজি থেকে
ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস	ব্যাকটেরিয়া	ঠিকমতো তাপমাত্রায় রান্না না করা পোলট্রিজাত খাবার আর পাস্তুরাইজ না করা দুধ থেকে
খাবারে বিষক্রিয়া	ব্যাকটেরিয়া	রান্না করা বাসি মাংস (বা অন্য পোলট্রিজাত খাবার) বা ফ্রিজ থেকে বার করা মাংস সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে, হালকা গরম করে খেলে; এমনকী ঠিকভাবে রান্না না করা মাংস বা পোলট্রিজাত খাবার খেলে
বটুলিসম	ব্যাকটেরিয়া	টিনবন্দি খাবার (Canned food) টিনবন্দি করার আগে ঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত না করা হলে

পাস্তুরাইজেশন

লুই পাস্তুর

খুব সহজ করে বললে, পাস্তুরাইজেশন হলো খাবার, বিশেষত তরল খাবার (যেমন-দুধ বা দুধ থেকে তৈরি খাবার, ফলের রস)-কে জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) আবিষ্কার করেন যে খুব অল্প সময়ের জন্য খাবারটিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করা হলে খাবারের মধ্যে থাকা সমস্ত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (স্পোর সমেত) নষ্ট হয়ে যায়। খাবারকে জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়াটির নামের সঙ্গে লুই পাস্তুরের নাম যোগ করার মধ্য দিয়ে তাঁর এই আবিষ্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তুকে একটা বিশেষ তাপমাত্রায় গরম করা হয়। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যবস্তুটিকে ঠান্ডা করে ফেলা হয়।

পাস্তুরাইজ করার জন্য দুধকে 15-40 সেকেন্ডের জন্য 72°-75° সেলসিয়াস বা 2 সেকেন্ডের জন্য 138° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করা হয়। দুধ ওই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছোনোর পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুধের তাপমাত্রা 3° সেলসিয়াসের নীচে নামিয়ে আনা হয়।

জীবাণু সংক্রমণের ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ

জীবাণুদের দ্বারা সংক্রামিত খাবারে বিষক্রিয়া ঘটে। আর তার ফলে ওই ধরনের জীবাণু-সংক্রামিত খাবার খেলে শরীরে নানারকম রোগ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এসো এবারে আমরা সেই লক্ষণগুলোর দিকে নজর দিই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কেবলমাত্র খাবারে বিষক্রিয়াই নয় অন্যান্য রোগেও এই ধরনের রোগ লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

আর একটা কথা মনে রেখো জীবাণু-সংক্রামিত খাবার খাওয়ার সাধারণত 2-3 ঘন্টার মধ্যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

লক্ষণগুলো হলো	
1. গা গোলানো এবং বমিভাব	4. জ্বর
2. পেটে অসহ্য যন্ত্রণা	5.মাথায় যন্ত্রণা
3. ডায়ারিয়া — বারে বারে পাতলা মলত্যাগ (রক্ত বা রক্ত ছাড়া)	6. দুর্বলতা 7.

এবারে লিখে ফেলো দেখি, খাবারে জীবাণুর সংক্রমণ বা পরজীবী রোগের হাত থেকে বাঁচতে কী কী করা যেতে পারে?
1.
2.
3.
4.

খাবার থেকে অ্যালার্জি

বায়ুবাহিত রোগের সম্বন্ধে জানার সময় তোমরা নানারকম **অ্যালার্জেন** আর তাদের থেকে সৃষ্ট **অ্যালার্জি** সম্বন্ধে জেনেছ।

কোনো কোনো খাবার খাওয়ার পরে পরেই হয়তো তোমাদের গলা চুলকোয়, মুখে বা গা-হাত-পায়ে চাকা চাকা লালা দাগ দেখা যায়, গা-হাত-পা খুব চুলকোয় — এই সমস্ত লক্ষণই ওই খাবারে থাকা অ্যালার্জেন থেকে হতে পারে।

বিভিন্ন খাবারে থাকা প্রোটিন বা অন্য কোনো উপাদানের বিরুদ্ধে কখনো-কখনো আমাদের শরীরের ইমিউন তন্ত্র নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। অনেক সময় চিংড়ি, বেগুনের মতো কোনো কোনো খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়। শরীরে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কোনো খাবারের বিরুদ্ধে, কখনও বা কোনো ওষুধের বিরুদ্ধে আবার কখনও বা কোনো পতঙ্গ কামড়ালে। বাইরে থেকে আসা প্রোটিনের বিরুদ্ধে শরীরের ইমিউন তন্ত্রের এই যে প্রতিক্রিয়া — এটাই হলো **অ্যালার্জি**। আমরা এখানে কেবলমাত্র বিভিন্ন খাবার থেকে হওয়া অ্যালার্জি নিয়েই আলোচনা করব।

খাবারের বিষক্রিয়া থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছ বুঝতে পারলে কী করবে?

1. ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো।
2. বারেবারে পাতলা মলত্যাগ হলে নুন-চিনির জল/ORS খেতে হবে।

অ্যালার্জির ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো এটাই যে একটা খাবার খেয়ে হয়তো একজনের শরীরে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া (Allergic reaction) দেখা গেল। অথচ তার পাশে বসা আরেকজন, যে ওই একই খাবার খাচ্ছে তার শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না।

কোনো খাবার খেয়ে তোমার কি কখনও অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা গেছিল? যদি তোমার নিজের ক্ষেত্রে এমনটা নাও ঘটে থাকে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো তাদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে কিনা। আর নীচে লিখে ফেলো।

অ্যালার্জি হওয়ার কারণ কী বলে মনে হয়	অ্যালার্জির কী কী লক্ষণ দেখা গেছিল	কীভাবে সেরেছিল

এবারে এসো এমন কয়েকটা খাবারের নাম জানি যাদের থেকে অ্যালার্জি হতে দেখা গেছে। তোমরাও শিক্ষক/শিক্ষিকা বা বাড়ির বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে আরও কিছু নাম যোগ করতে পারো।

1. ডিম	6. গম
2. সরষে	7. সয়াবিন
3. চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া	8. দুধ
4. শামুক, ঝিনুক	9. বাদাম
5. দুধ/দুগ্ধজাত খাবার	10.

খাবার থেকে হওয়া অ্যালার্জির সাধারণ লক্ষণ

1. গা-হাত-পায়ে লাল লাল চাকা চাকা দাগ	6. বমি
2. গা-হাত-পা চুলকানো	7. পেটে ব্যথা (Abdominal Cramp)
3. মুখ, ঠোঁট, গলা, জিভ ফুলে যাওয়া	8. ডায়ারিয়া
4. গলায় অস্বস্তি; শ্বাসকষ্ট	9.
5. চোখ-মুখ লাল হয়ে যাওয়া	10.

এবারে লিখে ফেলো দেখি, খাবার থেকে হওয়া অ্যালার্জির হাত থেকে বাঁচতে কী কী করা যেতে পারে?

1.

2.

3.

4.

অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দিলে কী করবে?

1. ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্বস্তি থেকে সাময়িক আরাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

2. কোন খাবার খেয়ে অ্যালার্জি হলো খুঁজে বার করার চেষ্টা করা। যাতে ভবিষ্যতে ওই খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

খাবারে ভেজাল

তোমরা তো অনেক সময়ই কথাটা শোনো — খাবারে ভেজাল মেশানো আছে। বলতে পারবে এই **ভেজাল**-টা কী? কী ক্ষতি করে আমাদের?

নীচের সারণিটি ভরতি করার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষক / শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কোন কোন খাবারে ভেজাল মেশানোর কথা তুমি জানো বা শুনেছ	কী মেশানো হয়েছে জানো কি	ওই খাবার খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে

এবারে জানার চেষ্টা করি খাবারে ভেজাল মেশানো আছে কথাটা আমরা কখন বলতে পারি।

(a) খাবারে এমন কিছু মেশানো হয়েছে, যাতে খাবারের খাদ্যগুণ কমে গেছে।

(b) খাবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো উপাদানের বদলে অন্য কোনো সস্তার জিনিস মেশানো আছে।

(c) খাবারটাকে আকর্ষক দেখানোর জন্য বা কাঙ্ক্ষিত স্বাদ আনার জন্য এমন কিছু জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে শরীরে নানারকম রোগ দেখা দিতে পারে।

এই ধরনের খাবার খেয়ে যে সমস্ত রোগ হতে পারে সেগুলোও একধরনের **খাদ্যবাহিত রোগ**।

কাকে ভেজাল খাবার বলবে, সে সম্বন্ধে তোমাদের তো একটা ধারণা হলো। তোমরা প্রতিদিন বাড়ির রান্না করা খাবারের বাইরে আর কী কী খাবার খাও তার একটা তালিকা তৈরি করো। এবারে বলার চেষ্টা করো তো ওইসব খাবারের মধ্যে কোন কোন খাবারে ভেজাল থাকতে পারে।

খাবারের নাম	ভেজাল থাকতে পারে কিনা	কীভাবে থাকতে পারে

তোমরা কি জানো, রঙিন মিষ্টি, লজেন্স, আইসক্রিমে থাকতে পারে এমন সব রং যা আমাদের শরীরে ডেকে আনতে পারে নানারকম রোগ, এমনকি ক্যানসারও! মেলায় বা রাস্তায় যে ঘুগনি বিক্রি হয়, অনেকসময় ঘুগনির ওই হলদে রংটা আনতে দোকানদার একটা ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। এমনকি গুঁড়ো হলুদেও অনেকসময় ওই রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। লাড্ডুতেও অনেকসময় এই রং ব্যবহার করা হয়।

শুধু রং নয়, বিভিন্ন খাবারে সুন্দর স্বাদ আনার জন্যও অনেকসময় ব্যবহার করা হয় ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ। চাউমিন আর চিলি-চিকেনের যে সুন্দর স্বাদ, তার পেছনেও রয়েছে একটা রাসায়নিক পদার্থ। ওই জিনিসটার নাম আজিনোমোটো। আসলে আজিনোমোটো যে কোনো খাবারে দিলে একটা মাংসের মতো স্বাদ আসে। অনেকদিন ধরে খেলে মানুষের শরীরে নানারকম সমস্যা তো হতেই পারে। বিশেষ করে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের কোশের ক্ষতি হতে পারে। রাস্তার ঠিক মান বজায় না রেখে তৈরি করা বিরিয়ানি আর মাংসতেও অনেক সময় ঠিকঠাক রং আর বাঞ্ছিত স্বাদ আনার জন্য মেশানো হতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ। এমনকি হোটেলে রান্না বিরিয়ানি বা মাংসের ক্ষেত্রেও এমনটাই হতে পারে।

অবশ্য সব রাস্তার বা সস্তা খাবারেই যে বাজে রং আর রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় তা নয়। যেসব খাবারে এই জিনিসগুলো মেশানো হয়, সেইসব খাবার একদিন কি দু-দিন খেলে হয়তো কিছু হবে না। কিন্তু অনেকদিন ধরে খেলে হজমের সমস্যা, স্নায়ুর বিভিন্ন রোগ, কিডনির রোগ এমনকি ক্যানসারও হতে পারে।

আসলে তুলনামূলকভাবে সস্তা খাবারে ঠিকঠাক স্বাদ, গন্ধ আর রং আনতে অনেক সময়ই নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সস্তার খাবারে মেশানো বেশির ভাগ রং আলকাতরার মতো জিনিস থেকে তৈরি। আলকাতরা কী, সেটা তো তোমরা জানো।

তোমরা কি জানো, দোলে যে রং খেলো সেইসব রঙে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যার ফলে তোমাদের চামড়ার নানারকম রোগ হতে পারে! তাই এখন ফুল থেকে নানারকম প্রাকৃতিক রং তৈরি করা হচ্ছে। এইসব রং সবদিক থেকেই বিপন্মুক্ত।

খাবারে ব্যবহার করার জন্য স্বীকৃত বিভিন্ন রং আর রাসায়নিক পদার্থ বাজারে আছে। দাম হয়তো বা একটু বেশি। কিন্তু ওইসব স্বীকৃত রাসায়নিক পদার্থ নির্ধারিত মাত্রায় খাবারে ব্যবহার করলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এসো এবারে দেখা যাক আমাদের প্রতিদিনের খাবারে কীভাবে ভেজাল মেশানো থাকতে পারে।

করে দেখো 1

একটা গ্লাসে কিছুটা দুধ নাও। দুধে কয়েক ফোঁটা টিংচার আয়োডিন মেশাও। কী দেখলে নীচে লেখো।

....

যদি দেখো দুধের রং নীল হয়ে গেলো, তাহলে বুঝবে যে ওই দুধে স্টার্চ মেশানো আছে।
দীর্ঘদিন ধরে স্টার্চ মেশানো দুধ খেলে পেটে ও শরীরের নানা অঙ্গে সমস্যা হতে পারে।

করে দেখো 2

কাটা আলুর টুকরোয় নুন মাখিয়ে কয়েক মিনিট রাখো। এরপর ওই আলুর টুকরোয় দু-ফোঁটা লেবুর রস দাও। আলুতে নীল রং দেখা গেলে বুঝবে নুনে আয়োডিনের যৌগ মেশানো (Iodized Salt) আছে।

নীল রং যদি দেখা না যায়, তাহলে কী বুঝবে? ....। এই ধরনের নুন খেলে কী ক্ষতি? ....।

করে দেখো 3

(a) কিছু গোটা সরষে নাও।

নমুনা সরষের রং — খুব একটা কালো নয়/ একদম কালো।

(b) নমুনা সরষের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখো।

নমুনা সরষের গাটা — মসৃণ/ মসৃণ নয়।

(c) একটা গোটা সরষের দানা হাতে নিয়ে ভেঙে দেখো।

দানার ভেতরটা — হলদে রঙের/ সাদা রঙের

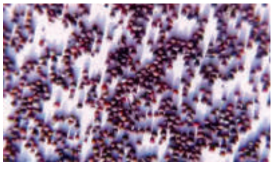

অনেকসময় সরষের বীজের সঙ্গে শিয়ালকাঁটার বীজ মেশানো থাকে। শিয়ালকাঁটার বীজ সরষের মতো দামি নয়। কিন্তু দেখতে প্রায় সরষে বীজের মতোই।

সরষে বীজের চেয়ে শিয়ালকাঁটার বীজ বেশি কালো রঙের হয়। আর বীজের গা-টা অমসৃণ হয় না,বীজের ভেতরটা হয় সাদা রঙের।

শিয়ালকাঁটার বীজ আর তার তেল

শিয়ালকাঁটার বীজ অনেকটা সরষের বীজের মতো দেখতে হয় — সেটা তো তোমরা জেনেছ। বুঝতেই পারছ সরষের তুলনায় শিয়ালকাঁটার বীজের দাম কম। শিয়ালকাঁটার বীজের তেল অনেকসময় সরষের তেলের সঙ্গে মেশানো হয়। এই ভেজাল সরষের তেল খেলে একটা রোগ হয় — যার নাম **ড্রপসি**। এই রোগে

ক্ষতিগ্রস্ত হয় চামড়া, যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক আর হৃৎপিণ্ড। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো বমি, ডায়ারিয়া, গা-বমি ভাব, জ্বর। এমনকি হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস অচল হয়ে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ড্রপসি রোগ ভারতবর্ষে ইদানীংকালে অনেকবারই হানা দিয়েছে। 1998 সালে দিল্লিতে, 2000 সালে গোয়ালিয়রে, 2002 সালে কনৌজে আর 2005 সালে লক্ষ্ণৌতে সরষের তেলে ভেজাল মেশানোর ফলে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ল্যাথিরিজম (Lathyrism)

অনেকসময় অড়হর ডালের সঙ্গে খেসারির (*Lathyrus sativus*) ডাল মিশিয়ে দেওয়া হয় বা বেসনের সঙ্গে খেসারির ডাল গুঁড়ো করে মেশানো হয়। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। অন্যান্য ডালের চেয়ে খেসারির ডালের দাম অনেকটাই কম। একটানা 2-3 মাস ধরে যথেষ্ট পরিমাণে এই ডাল খেলে পায়ে আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে (progressive spastic paralysis)। এটাই ল্যাথিরিজম। ইথিয়োপিয়া, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্তানে অনেকসময়ই এই রোগের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

অনেকসময় খাবারে/খাবারের কোনো উপাদানে কৃত্রিম ক্ষতিকারক কিছু রাসায়নিক রং মেশানো হয়, যা স্বীকৃত নয়। এসো এবারে সেইসব রঙের কয়েকটা সম্বন্ধে একটু জেনে নিই।

কৃত্রিম রঙের নাম	রং	কোন কোন খাবার/খাবারের উপাদানে মেশানো হতে পারে	শরীরে কী ক্ষতি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়
1.মেটানিল ইয়োলো (Metanil Yellow)	হলুদ	গুঁড়ো হলুদ, লাড্ডু, ...	অনেকদিন ধরে শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারও হতে পারে
2.ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite Green)	সবুজ	উচ্ছে, লঙ্কা, পটল	অনেকদিন ধরে শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারও হতে পারে।

মেটানিল ইয়োলো

ম্যালাকাইট গ্রিন

খাবারের মাধ্যমে সংক্রামিত রোগের হাত থেকে বাঁচতে কী কী করা যেতে পারে বলে তোমার মনে হয়?	
1.	3.
2.	4.

নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের পাঁচ চাবিকাঠি

(প্রতিটি ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা নিলে তোমার মনে হয় নিরাপদে খাবার খেতে পারবে?)

পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা (**Keep clean**)

i)

ii)

কাঁচা আর রান্না করা খাবার আলাদা রাখা (**Separate raw & cooked food**)

i)

ii)

ভালোভাবে আর পুরোপুরি রান্না করা (**Cook thoroughly**)

i)

ii)

নিরাপদ তাপমাত্রায় খাবার রাখা (**Keep food at safe temperature**)

i)

ii)

পরিষ্কার জল আর কাঁচামাল ব্যবহার করা (**Use safe water and raw materials**)

i)

ii)

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1. ভৌত পরিবেশ

ক) তাপ
খ) আলো
গ) চুম্বক
ঘ) তড়িৎ
ঙ) পরিবেশবান্ধব শক্তির ব্যবহার

2. সময় ও গতি

ক) গতির ধারণা
খ) দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ
গ) বলের ধারণা ও নিউটনের গতিসূত্র, বলের পরিমাপ
ঘ) শক্তি ও কার্য

3. পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

ক) চিহ্ন
খ) পরমাণুর গঠন
গ) সংকেত লেখার কৌশল
ঘ) রাসায়নিক বিক্রিয়া
ঙ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

4. পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা

ক) জীবদেহ গঠনে অজৈব ও জৈব পদার্থে ভূমিকা
খ) সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আম্লিক ও ক্ষারীয় দ্রব্য শনাক্তকরণ
গ) অম্ল ও ক্ষারের ধারণা; নির্দেশক ও প্রশমন
ঘ) মানবদেহের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য
ঙ) খাদ্য লবণ
চ) সংশ্লেষিত যৌগ ও পরিবেশে তার প্রভাব

5. মানুষের খাদ্য

ক) খাদ্য উপাদান
খ) অপুষ্টি ও স্থূলত্ব
গ) প্রাকৃতিক খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য
ঘ) জীবনে জলের ভূমিকা
ঙ) খাদ্য তৈরিতে জল ও আলোর ভূমিকা

6. পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া

ক) উদ্ভিদের দেহের গঠনগত বৈচিত্র্য
খ) পরাগমিলন ও সমস্যা
গ) ব্যাপন
ঘ) অভিস্রবণ
ঙ) অঙ্কুরোদগম

7. পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ

ক) জলবায়ুর পরিবর্তন
খ) জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা হ্রাস
গ) বর্জ্য ও মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি
ঘ) পরিবেশ রক্ষায় গাছের ভূমিকা

8. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য

ক) পরিবেশের সংকট ও স্বাস্থ্য
খ) মানুষের বিভিন্ন পেশা-সমস্যা ও রোগ
গ) স্বাস্থ্যের প্রকৃতি (দৈহিক ও মানসিক)
ঘ) সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার
ঙ) রোগ সংক্রমণে বাহকের ভূমিকা ও প্রতিকার
চ) খাদ্যবাহিত রোগ ও প্রতিকার

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ— (i) তাপ (1-14)	5
3.	পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া (85-100)	5
5.	মানুষের খাদ্য (145-181)	5

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1. ভৌত পরিবেশ—

(ii) আলো (15-37)	5
(iii) চুম্বক (38-48)	5
(iv) তড়িৎ (49-62)	5
(v) পরিবেশবান্ধব শক্তি (63-69)	5
(vi) পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া (182-226)	5

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :

2.	সময় ও গতি (70-84)	10
4.	পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা (101-144)	10
7.	পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ (227-255)	10
8.	পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য (256-307)	10

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত অধ্যায় তাপ; পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া; মানুষের খাদ্য; দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত আলো অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1. (i) তাপ	5
(ii)আলো	5
2. সময় ও গতি	10
3. পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া	10
4. পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা	10
5. মানুষের খাদ্য	10
6. পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ	10
7. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য	10

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
1) সারণি পূরণ	1) অংশগ্রহণ
2) ছবি বিশ্লেষণ	2) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
3) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	3) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
4) দলগত কাজ ও আলোচনা	4) সমানুভূতি ও সহযোগিতা
5) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	5) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
6) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন	
7) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি	
8) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো)

1. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতি প্রশ্নের নম্বর 1)

(i) জ্বর হওয়ায় কোনো রোগীর শরীরের উষ্ণতা পাওয়া গেল 104^{0}F। ওই উষ্ণতা সেলসিয়াস থার্মোমিটারে মাপলে সেই মান হবে— (a) 40.1 (b) 40.6 (c) 40 (d) 42

(ii) একটি থার্মোমিটার দিয়ে সবচেয়ে কম উষ্ণতা (-1^{o}) ও সবচেয়ে বেশি উষ্ণতা (99^{o}) মাপা যায়। ওই থার্মোমিটারে 1^{o} করে মোট কটি ঘর পাওয়া যাবে? (a) 100 (b) 99 (c) 101 (d) 98

(iii) সমতল আয়নার সঙ্গে লম্বভাবে কোনো আলোকরশ্মি ওই আয়নার ওপর আপতিত হলে, প্রতিফলন কোণের মান হবে— (a) 90^{o} (b) 0^{o} (c) 180^{o} (d) 45^{o}

(iv) রংধনু সৃষ্টির কারণ — (a) আলোর নিয়মিত প্রতিফলন (b) আলোর বিচ্ছুরণ (c) আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (d) আলোর রাসায়নিক পরিবর্তন।

(v) সূর্যের আলো 12 ঘন্টার কম স্থায়ী হলে নীচের কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভালো হয়?— (a) পটল (b) পালং (c) ঝিঙে (d) ঢ্যাঁড়শ

(vi) 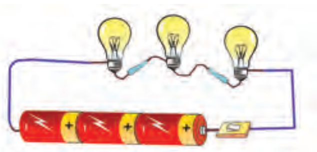 — এই চিত্রটির জন্য নীচের কোন বর্তনী চিত্রটি ঠিক

(a) 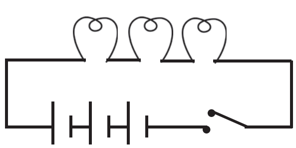

(b) 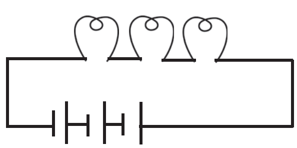

(c) 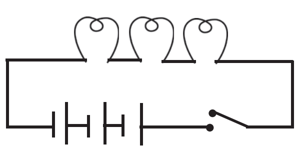

(d) 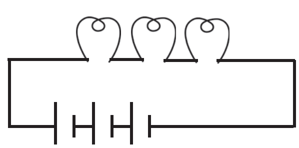

(vii) চুম্বকত্বের নিশ্চিত পরীক্ষা হলো — (a) শুধু আকর্ষণ ধর্মের পরীক্ষা (b) শুধুমাত্র বিকর্ষণ ধর্মের পরীক্ষা (c) আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় ধর্মের পরীক্ষা (d) চুম্বক আবেশের পরীক্ষা

(viii) একটি দণ্ডচুম্বককে তিনটি টুকরো করা হলো— (a) শুধু প্রান্তের টুকরো দুটিই চুম্বক থাকবে (b) শুধু মাঝখানেরটিই চুম্বক থাকবে (c) তিনটি টুকরোই চুম্বক থাকবে (d) কোনো টুকরোই আর চুম্বক থাকবে না

(ix) তড়িৎচুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি নীচের কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক হবে— (a) শুধু তারের পাকসংখ্যা বাড়ানো হলো, (b) শুধু তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বাড়ানো হলো (c) শুধু তড়িৎ প্রবাহের সময় বাড়ানো হলো (d) তারের পাকসংখ্যা ও তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা একসঙ্গে বাড়ানো হলো

(x) কোনো বস্তুকণার ওপর 3N বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুকণাটি বল প্রয়োগের দিকে 12m সরে গেল। এর ফলে মোট কাজের পরিমাণ হলো —(a) (12×3) J (b) $(12+3)$ J (c) $(12-3)$ J (d) $(12\div3)$ J

(xi) স্ক্রু-ড্রাইভারের গতি নীচের কোন গতির উদাহরণ — (a) সরলরৈখিক গতি, (b) বৃত্তাকার পথের গতি, (c) ঘূর্ণন গতি (d) মিশ্র গতি

(xii) জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) ও ফসফেট মূলক (PO_4^{3-}) দিয়ে গঠিত যৌগের সংকেত হবে— (a) $ZnPO_4$ (b) $Zn_2(PO_4)_3$ (c) $Zn(PO_4)_2$ (d) $Zn_3(PO_4)_2$

(xiii) $Pb(NO_3)_2 + FeSO_4 \rightarrow PbSO_4 + Fe(NO_3)_2$ — এই বিক্রিয়াটি কী ধরনের বিক্রিয়া? (a) প্রতিস্থাপন (b) প্রত্যক্ষ সংযোগ (c) বিয়োজন (d) বিনিময়

(xiv) ভিনিগারের মধ্যে কিছুটা খাবার সোডা মেশানো হলো। এর ফলে ভিনিগারের— (a) আম্লিক ধর্ম বৃদ্ধি পাবে (b) আম্লিক ধর্ম হ্রাস পাবে (c) ক্ষারীয় ধর্ম হ্রাস পাবে (d) ক্ষারীয় ধর্ম বৃদ্ধি পাবে।

(xv) নীচের কোন মৌলটি ছাড়া জীবকোশ গঠিত হওয়া অসম্ভব— (a) অ্যালুমিনিয়াম (b) সিলিকন (c) সোনা (d) কার্বন

(xvi) চুল, নখ, চামড়া ও পেশির অপরিহার্য উপাদান হলো— (a) কার্বোহাইড্রেট (b) খনিজ লবণ (c) প্রোটিন (d) লিপিড

(xvii) $^{35}_{17}Cl$ পরমাণুর ক্রমাঙ্ক ও নিউট্রন সংখ্যার যথাক্রমিক মান হলো— (a) 17,18 (b) 35,17 (c) 18,17 (d) 17, 35

(xviii) কোন পলিমারটি বায়োডিগ্রেডেবল— (a) পলিথিন (b) PVC (c) মাংসপেশির প্রোটিন (d) PET

(xix) লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের কাজে কোন ধাতুর আয়ন অপরিহার্য— (a) জিঙ্ক (b) ক্যালশিয়াম (c) সোডিয়াম (d) আয়রন

(xx) এমন একটি খাদ্য উপাদান যা থেকে শক্তি পাওয়া যায় না, সেটি হলো— (a) কার্বোহাইড্রেট (b) প্রোটিন (c) লিপিড (d) ভিটামিন

(xxi) অ্যানিমিয়া হলো — (a) আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ (b) ভিটামিন D-র অভাবজনিত রোগ (c) লৌহের অভাবজনিত রোগ (d) ভিটামিন A-র অভাবজনিত রোগ

(xxii) একটি সংশ্লেষিত খাদ্য হলো — (a) জ্যাম (b) আম (c) মাছের ঝোল (d) কোল্ড ড্রিংক্স

(xxiii) কাণ্ডের যে জায়গা থেকে শাখা বা পাতা বেরোয় সেই জায়গাটা হলো — (a) পর্ব (b) কক্ষ (c) পর্বমধ্য (d) বিটপ

(xxiv) ফুলের যে অংশটা ফলে পরিণত হয় সেটা হলো — (a) বৃতি (b) দলমণ্ডল (c) পরাগধানী (d) ডিম্বাশয়

(xxv) সাধারণ মাছি ছড়ায় এমন একটা রোগ হলো — (a) কালাজ্বর (b) অঙ্কোসারকিয়াসিস (c) টাইফয়েড (d) চিকুনগুনিয়া

(xxvi) ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো একটা — (a) বায়ুবাহিত রোগ (b) মশাবাহিত রোগ (c) মাছিবাহিত রোগ (d) জলবাহিত রোগ

2. নীচের যে কথাটি ঠিক তার পাশে '✓' আর যে কথাটি ভুল তার পাশে '✗' দাও : (প্রতি প্রশ্নের নম্বর 1)

(i) স্ত্রী মশা কেবলমাত্র ফলের রস পান করে। ☐ (ii) সাধারণ মাছি খাদ্য বা পানীয়ে মলত্যাগের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। ☐ (iii) সস্তার খাবারে মেশানো বেশিরভাগ রং আলকাতরার মতো জিনিস থেকে তৈরি। ☐ (iv) জন্মগত ত্রুটিও মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। ☐ (v) টিকাদানের মাধ্যমে জল বসন্তকে পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। ☐ (vi) ফ্লুওরাইডের প্রভাবে হাতের তালুতে খসখসে উঁচু উঁচু ছোপ দেখা যায়। ☐ (vii) কলেরা একটা বায়ুবাহিত রোগ। ☐ (viii) অনেকগুলো খাদ্যশৃঙ্খল একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে খাদ্যজাল। ☐ (ix) তাপমাত্রা কমলে ব্যাপন তাড়াতাড়ি ঘটে। ☐ (x) আমের বীজে একটা বীজপত্র থাকে। ☐ (xi) মটরগাছ কাণ্ডের পর্ব থেকে বেরোনো মূল বেয়ে ওপরে ওঠে। ☐ (xii) মূলে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। ☐ (xiii) প্রক্রিয়াজাত খাবারের তুলনায় প্রাকৃতিক খাবারের পুষ্টিগুণ কম। ☐ (xiv) একটি খাদ্য থেকে একাধিক খাদ্য উপাদান পাওয়া যেতে পারে। ☐ (xv) শক্ত দড়ির মতো টেনডন ও লিগামেন্ট প্রোটিন দিয়ে তৈরি। ☐ (xvi) ব্যাপনের সময় অণুরা কম গাঢ় অংশ থেকে বেশি গাঢ় অংশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ কর : (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)

(i) পদার্থের অবস্থা পরিবর্তনের সময় পদার্থের ______ অপরিবর্তিত থাকে। (ii) দুটি ভিন্ন উষ্ণতার পদার্থ সংস্পর্শে থাকলে কোন পদার্থ তাপ গ্রহণ করবে আর কোন পদার্থ তাপ ছাড়বে তা পদার্থ দুটির ______ এর ওপর নির্ভরশীল। (iii) সূর্য থেকে আসা আলোক রশ্মিগুচ্ছকে ______ আলোক রশ্মিগুচ্ছ বলা যেতে পারে। (iv) তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার কাছে থেকে কোনো আয়নাকে 1m দূরে সরিয়ে নেওয়া হলো। তোমার প্রতিবিম্ব তোমার কাছ থেকে ______ m দূরে সরে যাবে। (v) একটি দণ্ড চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য 7cm হলে তার চৌম্বক দৈর্ঘ্য ______ cm হবে। (vi) কোনো সেলে রাসায়নিক শক্তি ______ শক্তিতে পরিণত হয়। (vii) কয়লা হলো এক গুরুত্বপূর্ণ ______ জ্বালানি। (viii) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদা ______ বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়। (ix) প্রোটন ______ তড়িৎযুক্ত, ইলেক্ট্রন ______ তড়িৎযুক্ত কণা। (x) নাইট্রেট, সালফেট ও কার্বনেট মূলকের সংকেত হলো ______, ______ ও ______। (xi)স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে সংকেত যাওয়া আসায় প্রয়োজন হয় ______, ______ ও ______ আয়ন। (xii) কোনো দ্রবণের pH 10 হলে তাকে ______ প্রকৃতির বলা যেতে পারে। (xiii) পাতিলেবুর টক স্বাদের জন্য দায়ী হলো ______ ও ______ অ্যাসিড। (xiv) পাকস্থলীর রসের pH প্রায় 1 তাই বলা যায় সেটি যথেষ্ট ______ প্রকৃতির। (xv) গলগন্ড বা গয়টার রোগে ______ গ্রন্থি ফুলে ওঠে। (xvi) ______ জাতীয় যৌগ বহু সংখ্যক ছোটো ছোটো অণু জুড়ে তৈরি হয়। (xvii) চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেলকে কস্টিক ক্ষার সহ গরম করে ______ তৈরি করা হয়। (xviii) একই উষ্ণতায় হালকা অণুদের চেয়ে ভারী অণুদের ব্যাপনের হার ______। (xix) চুল ও নখে ______ প্রোটিন থাকে। (xx) জলে গুলে যায় এমন একটা ভিটামিন হলো ______। (xxi) ______ পত্রবৃন্তকে কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত করে। (xxii) পরাগধানীতে থাকে ______। (xxiii) একটা সরল ফল হলো ______। (xxiv) দোপাটি হলো ______ ফুল। (xxv) একই উষ্ণতায় গ্যাসীয় অবস্থার চেয়ে তরলে ব্যাপন ঘটে ______। (xxvi) আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা হলো ______। (xxvii) ______ হলো একটি অতিবৈচিত্র্যের দেশ। (xxviii) মূলযুক্ত উদ্ভিদ মাটির ______ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। (xxix) মাছি দ্বারা সংক্রামিত একটা রোগ হলো ______। (xxx) আঘাতপ্রাপ্ত বা রোগাক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলতে ______ রশ্মি ব্যবহার করা হয়। (xxxi) পুরুষ মশার প্রোবোসিসটি ______। (xxxii) মশা হলো ______ বাহক। (xxxiii) ______ বীজের তেল মেশানো সরষের তেল খেলে ড্রপসি নামে একটা রোগ হয়।

4. বেমানান শব্দ বা নামটিকে খুঁজে বার করো : (প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 1)

i) প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ii) পোলিও, কলেরা, ম্যালেরিয়া, সাধারণ ডায়ারিয়া iii) আত্মসচেতনতা, মানসিক অবসাদ, মনোযোগহীনতা, মানসিক উদবেগ iv) বীজত্বক, বীজপত্র, ফলত্বক, ভ্রূণাক্ষ v) মুলো, আলু, বীট, গাজর vi) সাইবেরিয়ার বাঘ, হাতি, গঙ্গার শুশুক, কস্তুরী মৃগ vii) শিয়ালকাঁটার বীজ, খেসারির ডাল, দুধ, মেটানিল ইয়োলো

5. স্তম্ভগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : **(প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1 নম্বর)**

নমুনা হিসাবে একটি উত্তর করে দেওয়া হলো ।

I.

‘A’ স্তম্ভ	‘B’ স্তম্ভ	‘C’ স্তম্ভ
i) পটাশিয়াম পরমাণু	a) আয়োডিনের অভাব	1) ক্যাটায়ন দেয়।
ii) Zn^{2+} ও Cl^- আয়ন	b) কস্টিক ক্ষার	2) জিঙ্ক ক্লোরাইড গঠন করে
iii) থাইরয়েড গ্রন্থি	c) প্রাকৃতিক পলিমার	3) তীব্র আম্লিক
iv) চর্বি	d) 1টি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে	4) সাবান
v) লঘু HCl দ্রবণ	e) 1: 2 সংখ্যার অনুপাতে যুক্ত হয়ে	5) বায়োডিগ্রেডেবল
vi) নাইলন	f) মিথাইল অরেঞ্জ	6) গয়টার
vii) স্টার্চ বা শ্বেতসার	g) কৃত্রিম পলিমার	7) নন-বায়োডিগ্রেডেবল
viii) পাকস্থলীর রস	h) pH প্রায় 1	8) লাল

উ: ii - d - 2

II.

‘A’ স্তম্ভ	‘B’ স্তম্ভ
i) চৌম্বক দৈর্ঘ্য	a) তড়িৎ শক্তির আলোক ও তাপশক্তিতে রূপান্তর
ii) সূর্যের তাপের প্রভাব	b) তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি
iii) প্রাকৃতিক বর্ণালী	c) সমান মানের কিন্তু বিপরীতমুখী দুটি বল
iv) তারের পাক সংখ্যা বৃদ্ধি	d) উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সংযোজক রেখাংশের দৈর্ঘ্য
v) LED	e) দিনের বেলায় বাবলা গাছের পাতা খুলে যায়
vi) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	f) রংধনু

III.

‘A’ স্তম্ভ	‘B’ স্তম্ভ
i) প্রোটিন ও শক্তির অভাব	a) নিডারিয়া
ii) মাটি থেকে জল ও খনিজ পদার্থ শোষণ	b) রেসারপিন
iii) কোয়ালা ভালুক	c) কার্বন ডাইঅক্সাইড
iv) ঘুম আর খিদে বেড়ে যাওয়া	d) যক্ষ্মা
v) মলের রং চাল ধোওয়া জলের মতো	e) মূলরোম
vi) সর্পগন্ধা	f) বায়োডাইভারসিটি হটস্পট
vii) প্রবাল	g) ম্যারাসমাস
viii) গা-হাত-পায়ে চাকা চাকা লাল দাগ	h) ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা
ix) গাছের খাবার তৈরির উপাদান	i) মানসিক অবসাদ
x) সুন্দাল্যান্ড	j) অ্যালার্জি
	k) কলেরা

6. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : **(প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 1)**

(i) কোনো বস্তুর ওপর ‘ক’ 10 N ও ‘খ’ ওই একই বস্তুর ওপর 7 N বল প্রয়োগ করার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই কৃতকার্যের পরিমাণ একই হয়। কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির সরণ বেশি হয়েছে? (ii) এমন একটি উদাহরণ দাও যেখানে প্রতিমুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হলেও রৈখিক ত্বরণের মান শূন্যই থাকে। (iii) কুলোর সাহায্যে চাল ঝাড়া হচ্ছে — এটি কোন জাড্যের উদাহরণ বলে তুমি মনে করো? (iv) সুইচ অন করলে কোনো বর্তনী ‘মুক্ত’ না ‘বদ্ধ’ হয়? (v) একটি লোহার টুকরোকে একটি শক্তিশালী চুম্বকের সামনে আনলে তা

সাময়িকভাবে একটি চুম্বকের মতো আচরণ করতে পারে। এটি চুম্বকের কোন্ ধর্মের জন্য হয়? (vi) আয়নায় P,A,C,O,M,T,S অক্ষরগুলির মধ্যে কোনগুলির প্রতিবিম্বে পার্শ্বীয় পরিবর্তন ঘটবে না? (vii) এমন একটি পদার্থের উদাহরণ দাও যাকে তাপ দিলে গলন না হয়ে সরাসরি বাষ্পীভবন হয়। viii) সমীকরণসহ বিয়োজন বিক্রিয়ার উদাহরণ দাও। ix) অ্যাসিড-ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি উদাহরণ দাও। x)পরিবর্তনশীল যোজ্যতা আছে এমন দুটো ধাতুর চিহ্ন লেখো। তোমার বক্তব্যের সপক্ষে প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও। xi) খাবার তৈরিতে আজিনোমোটো ব্যবহার করা হয় কেন? xii) লোহিত রক্তকণিকায় থাকা একটা প্রোটিনের নাম লেখো। xiii) দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করে কোন খনিজ মৌল? xiv) খাদ্যতন্তু পাওয়া যায় এমন একটা খাবারের নাম লেখো। xv) বেলের শাখাকণ্টক কী ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড? xvi) অন্যান্য শর্ত একই থাকলে হালকা আর ভারী অণুর ক্ষেত্রে ব্যাপনে কী পার্থক্য লক্ষ করা যায়? xvii) অভিস্রবণে কোন ধরনের পর্দার মাধ্যমে দ্রবণে দ্রাবকের অণুর আসা-যাওয়ার ঘটনা ঘটে? xviii) *Plasmodium vivax* কোন রোগের জীবাণু? xix) নোংরা জলে ডিম পাড়ে কোন ধরনের মশা? xx) ফ্লুওরেসেন্ট বালব তৈরি করতে কোন ধাতুর বাষ্প ব্যবহার করা হয়? xxi) একটা দ্বিবীজপত্রী বীজের বীজত্বকের স্তরগুলোর নাম কী কী?

7. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 2)

i) আকাশে যে রংধনু তুমি দেখতে পাও তা আসলে কী এবং তা আলোর কোন ধর্মের জন্য ঘটে? প্রিজম ছাড়া কীভাবে তা সম্ভব হয়? ii) উষ্ণতার কোন মান সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট উভয় স্কেলেই সমান হয়? iii) শুষ্ক বায়ু যে তড়িতের কুপরিবাহী তা তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে? iv) দুটি স্টেশনের দূরত্ব 400 km। একটি ট্রেন আপে যাওয়ার সময় 50 km/h বেগে যায় ও ডাউনে 40 km/h বেগে ফিরে আসে। যাতায়াতে ট্রেনটির গড় বেগ কত? v) একটি খেলার বলকে ‘ক্যাচ’ লোফার পর বলশুদ্ধ হাতকে বলের গতির দিকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়া হয় কেন? vi) একটি খালি বালতির ভিতরের তলদেশে একটি কয়েন রেখে বালতিটি জলপূর্ণ করার পর ওপর থেকে দেখলে কয়েনটি কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে বলে মনে হয় কেন? vii) থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলতে কী বোঝ? একটি উদাহরণ দাও। viii) সিমেন্ট-বালি দিয়ে ঢালাই করার পর দিন থেকে ঢালাইতে জল দেওয়া হয় কেন? ix) প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়ার বিপরীত বিক্রিয়াকে কী ধরনের বিক্রিয়া বলা যেতে পারে? একটি উদাহরণ দাও। x) সমীকরণ দুটোর সমতা বিধান করো (a) $Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$ (b) $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow CuO + 4NO_2 + O_2$ xi) দুটি কৃত্রিম পলিমারের নাম লেখো। xii) মানবদেহের ওজনের প্রায় 97% যে চারটি মৌলের মিলিত ভর সেই মৌলগুলি কী কী? xiii) চামড়ার নীচে লিপিডের স্তরের প্রয়োজনীয়তা কী? xiv) ম্যালেরিয়া রোগের একটা মুখ্য আর একটা গৌণ পোষকের নাম লেখো। xv) হাড় ও দাঁতের গঠন ঠিক রাখা কোন কোন ভিটামিনের কাজ? xvi) খাবার তৈরি করতে গাছ পরিবেশ থেকে কোন কোন উপাদান গ্রহণ করে? xvii) জলশোষণ ছাড়াও মূলের অন্য দুটো কাজের কথা লেখো। xviii) খাদ্য সঞ্চয় করে এমন একটা একটা পাতার নাম লেখ। xix) অতিরিক্ত বাষ্পমোচনে বাধা সৃষ্টি করে এমন একটা পাতার নাম লেখো। xx) একটা স্বপরাগী আর একটা ইতরপরাগী ফুলের নাম লেখো। xxi) পরিবেশের এমন দুটো গ্যাসীয় পদার্থের নাম লেখো বিশ্ব উষ্ণায়নে যাদের ভূমিকা আছে। xxii) ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আছে এমন দুটো বায়োডাইভারসিটি হটস্পটের নাম লেখো।

8. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 3)

i) একটি বর্তনীর ছবি আঁকো যাতে দুটি বালব, চারটি সেল দিয়ে তৈরি ব্যাটারী, প্রয়োজন মতো তার ও একটি সুইচ (অফ্ অবস্থায়) থাকবে। ii) একটি কাচের গ্লাসের ওপর একটা কার্ডবোর্ড রাখা আছে। কার্ডবোর্ডটির মাঝখানে রয়েছে একটি কয়েন। কার্ডবোর্ডটাকে জোরে টোকা মারলে তা ছিটকে সরে যাবে কিন্তু কয়েনটা গ্লাসে পড়বে— কারণ ব্যাখ্যা কর। iii) ধরা যাক একটি ডোবায় স্বচ্ছ জল আছে। ডোবার তলদেশের কাছাকাছি একটি ছোটো মাছ স্থির হয়ে ভেসে আছে। পাড় থেকে এক ব্যক্তি তার বন্দুক দিয়ে মাছটিকে যতবার গুলি করছে ততবারই ফস্কে যাচ্ছে— কারণ ব্যাখ্যা কর। iv) কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ তিন গুণ করা হলে বস্তুটির সরণ পূর্বের সরণের পাঁচগুণ হয়। কৃতকার্য পূর্বের কতগুণ হবে? v) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয় না এবং তারা একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়। একটি পরীক্ষার সাহায্যে তা বুঝিয়ে দাও। vi) 0^oC উষ্ণতায় 5 গ্রাম বরফকে কত তাপ দিলে তা 0^oC উষ্ণতায় 5 গ্রাম জলে পরিণত হবে। vii) জলে ভেজা গায়ে দাঁড়ালে তোমার ঠান্ডা লাগে। তবে জলে ভেজা গায়ে ঘূর্ণায়মান পাখার তলায় দাঁড়ালে তোমার বেশি ঠান্ডা লাগে কেন? viii) আলোর প্রতিফলনের জন্য আমরা কী সুবিধা পেতে পারি? ix) পৃথিবী একটা বিরাট চুম্বক না হলে কী কী ঘটনা ঘটত? x) কী কী উপায়ে তুমি শক্তির অপব্যবহার কমাতে পারো? xi) কোথায় কোথায় সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়। বেশি সৌরশক্তি ব্যবহার করার কয়েকটি অসুবিধার কথা লেখো। xii) ঘূর্ণনগতি, বৃত্তাকার গতি, মিশ্র গতির একটি করে উদাহরণ দাও। xiii) অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কয়েকটি কুফল উল্লেখ করো। xiv) রক্তে নুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কী কী শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে?

xv) মানবদেহে ক্যালশিয়াম ও আয়রনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো। xvi) তোমাকে দুটো বর্ণহীন জলীয় দ্রবণ দেওয়া হয়েছে। এর একটা ক্ষারীয় ও অন্যটা আম্লিক। কী কী পরীক্ষা করে তুমি কোনটা আম্লিক ও কোনটা ক্ষারীয় তা চিনবে? (কোনো দ্রবণ মুখে দিয়ে পরীক্ষা করা চলবে না, তা নিরাপদ নয়)। xvii) ব্যাপন বলতে কী বোঝায়? একই উষ্ণতায় গ্যাসীয় ও দ্রবণ অবস্থায় ব্যাপনের ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ধীরে ঘটে? xviii) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ব্যাপন কীভাবে প্রভাবিত হয়? xix) ব্যাকটেরিয়া কোশের কোশপ্রাচীর তৈরিতে বাধা পড়লে কী হতে পারে? xx) দেহের ওজন অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়া কী কী বিপদ ডেকে আনতে পারে? xxi) কী কী কারণে মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে তোমার মনে হয়? xxii) জীবাণু সংক্রমণের ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার কয়েকটা লক্ষণ লেখো। xxiii) প্লেগের সংক্রমণ কীভাবে ঘটে? xxiv) অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার তিনটে পার্থক্য লেখো। xxv) জীবনকুশলতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী? xxvi) খাদ্যশৃঙ্খলটা সম্পূর্ণ করো : ফুলের মধু → [ ] → [ ] → [ ] xxvii) চোরাশিকারের ফলে একটা বনে বাঘ বা অন্য বড়ো মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে গেল। এর ফলাফল কী হতে পারে? xxviii) উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ গলে গেলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে? xix) কলেরা রোগীর শরীরে নুন - গ্লুকোজ মেশানো জল প্রবেশ করানো হয় কেন?

9. 'আমি কে' লেখ : **(প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 1)**

(a) (i) আমার সারা দেহ রোমে ঢাকা।
(ii) আমার বুক ধূসর রঙের।
(iii) আমার পিঠে চারটে লম্বা কালো দাগ আছে।
(iv) আমি নানারকম রোগ ছড়াই।
আমি ____________________।

(b) (i) আমি সারাক্ষণ তোমাদের চারপাশেই আছি।
(ii) চুনাপাথরকে উত্তপ্ত করলে আমাকে পাবে।
(iii) আমি বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ।
(iv) আমার সাহায্যে গাছেরা খাবার তৈরি করে।
আমি ____________________।

10. সূত্রের সাহায্যে শব্দছকটি পূরণ কর : **(প্রতিটি শব্দের জন্য 1 নম্বর)**

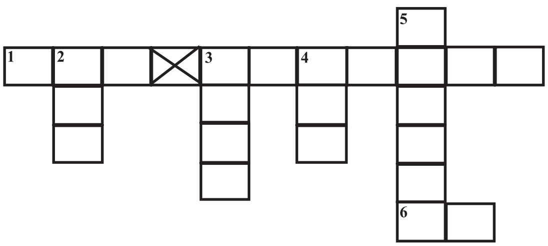

সূত্র

পাশাপাশি : 1. যে প্রক্রিয়ায় ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে
3. জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন জলের অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে যা তৈরি হয়
6. জৈব বাহক

ওপরনীচ : 2. একটা মৃদগত কান্ডের ইংরাজি নাম
3. তড়িৎ চুম্বকের কৃপায় কম্পিউটারের তথ্যের ভাঁড়ার
4. শিয়ালকাঁটার বীজের তেল মেশানো সরষের তেল খেলে এই রোগ হয়
5. এর থেকে পেনিসিলিন তৈরি করা হয়

11. একটা ফলের ছবি এঁকে বহিঃত্বক, অন্তঃত্বক ও বীজের অবস্থান দেখাও। **[3 + (1/2 × 4) = 5]**

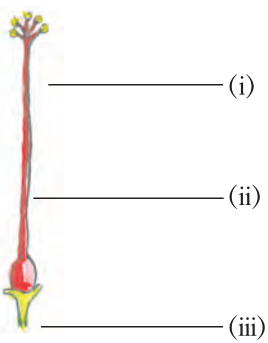

12. পাশের ছবিতে গর্ভমুণ্ড, গর্ভদণ্ড ও গর্ভাশয়ের অবস্থান দেখাও। (প্রতিটি অংশ দেখানোর জন্য 1 নম্বর)

শিখন পরামর্শ

এই বইটিতে পরিবেশের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞানের ধারণার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। পঠন-পাঠনের প্রয়োজনে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবনবিজ্ঞানের উপযুক্ত এককগুলি নির্বাচনে শিক্ষক/শিক্ষিকা নমনীয় হতে পারেন। এই বইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে **'আকাদেমি বানান অভিধান'** অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: তাপ, আলোক, চৌম্বক ও তড়িৎশক্তির প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি বহুসংখ্যক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সহজভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। জীবজগতে এগুলির প্রভাব নানা উদাহরণের সাহায্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করতে, প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করতে ও বিশ্লেষণ করতে শিক্ষক/শিক্ষিকারা সাহায্য করবেন। 36, 37,48 এবং 62 পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিউটনের সূত্রগুলির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত সূত্রগুলি না বুঝে মুখস্থ করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের মনে সূত্রগুলির মূল বিষয় সম্পর্কে যাতে ধারণা স্পষ্ট হয় সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিশেষ নজর রাখবেন। দ্বিতীয় গতিসূত্রের প্রচলিত রূপটি লেখা হয়নি, কারণ স্থির ভরবিশিষ্ট বস্তুর বেলাতেই সূত্রটির আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নিউটনের জীবনী (76 পৃষ্ঠা) থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে রসায়নের জগতে প্রবেশ করতে **পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া** সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় ধারণাগুলির অবতারণা করা হয়েছে। চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণের সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কিছু উদাহরণ এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসায়নিক সমীকরণের সমতাবিধান করতে শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্যোগী হয় সেইদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা বিশেষ নজর রাখবেন।

চতুর্থ অধ্যায়: 'পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায়ে জীবদেহ গঠনে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন **আম্লিক ও ক্ষারীয় দ্রব্য** শনাক্তকরণে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে পরীক্ষা করবে, এটাই কাম্য। মানবদেহে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হলে কী কী সমস্যা হতে পারে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন **খাদ্যলবণ, সংশ্লেষিত যৌগ ও পরিবেশে তার প্রভাব** সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানোর জন্য বহুমুখী কর্মপত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। 119 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা', 128 ও129 পৃষ্ঠার 'জেনে রাখো', 136 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা', 139 পৃষ্ঠার 'জানো কি?' থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে পরিচিত নানা **খাদ্যে কী কী খাদ্য উপাদান** থাকে ও তার অভাবে কী সমস্যা হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **অপুষ্টি ও স্থূলত্বের** মতো বিষয়গুলি যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিভিন্ন **সংশ্লেষিত খাদ্য** নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **জলপানের প্রয়োজনীয়তা** বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। **খাদ্য তৈরিতে জল ও আলোর** ভূমিকা দেখানো হয়েছে। 154 পৃষ্ঠার ভিটামিনের ইতিহাস ও 172 পৃষ্ঠার পৃথিবীর মিষ্টি জলের হিসেবনিকেশ থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এই অধ্যায়টিতে **উদ্ভিদের দেহগঠনের বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্য** সম্পর্কে নানা তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এখানেও অনেক হাতেকলমে কাজের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশে জীবরা কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নেয় তা বোঝানোর জন্য **ব্যাপন ও অভিস্রবণ** প্রক্রিয়ার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: পরিবেশ দূষণ ও দূষণজনিত ক্ষতি আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। পরিবেশের ক্ষতির নানান ভয়াবহ দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচেতন করতে **জীববৈচিত্র্যের ধারণা, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বর্জ্য ও মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি** অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থী যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে **পরিবেশ রক্ষায় নানা গাছের ভূমিকা** উপলব্ধি করবে । 231 ও 232 পৃষ্ঠায় দেওয়া বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও 249 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

অষ্টম অধ্যায়: আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড দূষণ, পেশা ও সমস্যা এবং সমাজে ক্রমবর্ধমান মানসিক রোগের সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার চেষ্টা হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দুটি বিষয়। কীভাবে **দূষিত পরিবেশ জনস্বাস্থ্যকে** প্রভাবিত করে সেই বিষয়ে শিক্ষার্থী অবহিত হবে এই অধ্যায়ে। 256 পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা', 265 পৃষ্ঠার WHO এবং UNICEF সম্বন্ধীয় বিষয় ও 281 পৃষ্ঠায় 'কলেরা রোগের ইতিহাস' থেকে প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন অধ্যায়ের উপরোক্ত পৃষ্ঠাগুলি ছাড়াও বইয়ের অন্যত্র শিক্ষার্থীর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এইসব অংশ থেকে নিছক জ্ঞানমূলক প্রশ্ন না করাই বাঞ্ছনীয়।

আমার পাতা

এই বই তোমার কেমন লেগেছে লেখো।